Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13
বিজ্ঞান মনস্ক'র ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সমীক্ষণ

নবম বর্ষ❖সংখ্যা ১❖ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মেঘালয়ের 'বে-আইনী' কয়লা খাদানে ১৫ জন শ্রমিকের সলিল সমাধি

■সম্পাদকীয় ঃ বিজ্ঞান মনস্কতা
■মোবাইল ফোন মানুষের উপর কী প্রভাব ফেলেছে?
■কলকাতা শহর ভূমিকম্পে আদৌ নিরাপদ কী?

বিজ্ঞান কংগ্রেস!

★ কৌরবদের জন্ম হয়েছে 'স্টেম সেল' ও 'টেস্ট টিউব' প্রযুক্তির সাহায্যে
★ ভগবান ব্রহ্মা পৃথিবীতে ডাইনোসরের অস্তিত্ব দেখেছিলেন
★ চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ এর বিকৃশিত রূপ 'বিষ্ণুর দশাবতার' তত্ত্ব
★ রাবণের কাছে ২৪ ধরণের বিমান ছিল এবং লঙ্কায় ছিল বিমান বন্দর
★ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র হল নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র বা গাইডেড মিশাইল

বিজ্ঞান কংগ্রেসে অবৈজ্ঞানিক দাবী সরব বিজ্ঞানীমহল ও বিজ্ঞানকর্মীরা

2nd COVER

নবম বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ বিজ্ঞান মনস্কতা

সমাজ দর্পণ ঃ
- **বিজ্ঞান কংগ্রেসে অবৈজ্ঞানিক দাবী** ৪
- **ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস** ৬
- **মেঘালয়ের কয়লা খাদানে শ্রমিকদের সলিল সমাধি** ১১
- **মেঘালয় পাহাড়ের এক ইঁদুরের কথা** ১২
- **মোবাইল ফোন মানুষের উপর কী প্রভাব ফেলেছে?** ১৩

বিশেষ রচনা ঃ
- **কলকাতা শহর-শহরতলী – ভূমিকম্পে নিরাপদ কী?** ১৮

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ
- **মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ** ২১
- **মহাকাশ গবেষণার রোজনামচা** ২৮

ইতিহাসের পাতা থেকে ঃ
সুকুমার রায়ের রচনা – 'কাঁচ' ৩১

কুসংস্কার ও বিজ্ঞান ঃ
সত্যি ভুত – মিথ্যে ভুত ৩৫

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ
- **বদলে গেল কিলোগ্রাম** ৫

চিঠিপত্র ঃ ৩০

বিজ্ঞানের খবর ঃ ৩৩

সংগঠন সংবাদ ঃ ৩৯

সম্পাদকীয় ঃ

বিজ্ঞান মনস্কতা

বর্তমানে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ বিজ্ঞানের সুফলগুলি অর্জনে বঞ্চিত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে ব্যর্থ। বিজ্ঞান হলো বস্তুর উৎপত্তি, বিকাশ ও লয়-এর কারণ তথা নিয়ম। এই নিয়ম হলো পরিবর্তনের নিয়ম। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ করা যায় যে মানব সমাজের উৎপত্তি থেকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত মানব সমাজের বিকাশ যে হারে ঘটেছিল তা ছিল বর্তমানের তুলনায় অতি মন্থর। আসলে সমাজের বিকাশ উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সমানুপাতিক। স্পষ্টতই শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে উৎপাদন বিকাশের হার অনিয়ন্ত্রিত ত্বরণ যুক্ত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর কারণ যে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভব ও প্রয়োগ, তা অনস্বীকার্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ইতিহাস হলো শ্রেণীহীন মানব-সমাজের ইতিহাস। এই শ্রেণীহীন মানব সমাজে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে জোটবদ্ধ মানুষের দল। তারা উদ্ভিজ খাদ্য যেমন সংগ্রহ করেছে তেমনই শিকার করেছে প্রাণী। এই পর্যায়ে মানুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো হাতিয়ারের ব্যবহার। অভিজ্ঞতার নিরীখে হাতিয়ারের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে হাতিয়ারের ক্রমাগত উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার আবিষ্কার, আগুনের ব্যবহার, পশুপালন এবং শেষপর্যন্ত কৃষির উদ্ভব – সূচনা করল মানব সভ্যতার ইতিহাস।

এ যাবৎ আবিষ্কৃত সকল প্রাচীন সভ্যতাই কৃষি নির্ভর। কৃষিই হলো মানব সমাজে প্রথম উৎপাদনের সূচনা। এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং হিংস্র বন্য জন্তুকে মোকাবিলা করার জন্য হাতিয়ারের উন্নতির ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এক সময়ে এমন এক হাতিয়ার তৈরী করতে সমর্থ হলো যখন ঐ হাতিয়ার দিয়ে কোন একক ব্যক্তি এককভাবে কোন হিংস্র জন্তুর মোকাবিলা করতে পারে। ঐ হাতিয়ারই হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভ্রূণ। কৃষির উদ্ভব মানব সমাজে উৎপাদন শুরু করলেও তা তৎকালীন সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়নি। আবার পাশাপাশি সাময়িকভাবে খাদ্য শষ্যকে সঞ্চয় করাও সম্ভব হয়েছিল। উন্নত হাতিয়ারের মালিকরা সমাজের মালিক হয়ে ওঠে। সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পরে। মালিকানার জোরে উৎপাদিত পণ্যকে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করা শুরু হয়। ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির এবং তার উত্তরাধিকারের রীতি সমাজে চালু হয়। এই সময় এক দলের সঙ্গে অন্য দলের যুদ্ধ হলে প্রথম দিকে যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করা হতো। পরে যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বেশি মানুষকে উৎপাদনে যুক্ত করা গেলে, তাদের খোরাকি থেকে বেশি উৎপাদন করা সম্ভব তখন থেকে যুদ্ধবন্দিদের

দাসে পরিণত করে উৎপাদনে যুক্ত করা শুরু হয়। ক্রমে সমাজের বেশিরভাগ মানুষকে দাসে পরিণত করে উৎপাদনে যুক্ত করা হলো। উৎপাদন বৃদ্ধি পেল – যা দাস মালিকদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হলো কিন্তু সমাজের সাধারণের অভাবপূরণ হলো না।

দাস ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, সামন্ত ব্যবস্থা, এমন কি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের শাসক তার রাষ্ট্রের বাৎসরিক উৎপাদনকে যদি কুক্ষিগত না করে রাষ্ট্রের সকলের মধ্যে বন্টন করতো তাহলেও সেই রাষ্ট্রের সকলের প্রয়োজন মেটাতে পারতো না। রাজ পরিবারগুলির সম্পত্তি আসলে কয়েক পুরুষের কুক্ষিগত সম্পত্তি। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাম্য ছিল অভাবে পূর্ণ। সে অভাব ছিল সমাজের সকলের। আর শ্রেণী বিভক্ত সমাজে অভাব মিটে উদ্বৃত্ত হলো মালিক শ্রেণীর। কিন্তু এই সমাজে শ্রমজীবীদের অভাব মেটানো সম্ভবই নয়।

ইউরোপে প্রাক্ পুঁজিবাদী যুগে, প্রকৃতির নিয়মগুলি জানা শুরু হয়। আজ পর্যন্ত প্রকৃতির বিষয়ে সামান্য কিছু জানা সম্ভব হলেও, বিগত কয়েক শতকের এই জ্ঞান, সমগ্র মানব সভ্যতার নিরীখে গুণে ও পরিমাণে অভূতপূর্ব। প্রকৃতির বিষয়ে এই সামান্য জ্ঞানই, দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির বিষয়ে হাজার হাজার বছরের বহমান ধারণার অবসান ঘটায়। বহু কাল্পনিক অলৌকিক ঘটনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। সেসময় বিজ্ঞানের আলোকে আপাত অলৌকিক ঘটনাবলীর স্বরূপ উন্মোচন করাই ছিল বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়। এই স্বরূপ উন্মোচনই তৎকালীন শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন করায় সক্রেটিস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর ন্যায় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অত্যাচারিত, দন্ডিত হতে হয়েছিল।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে, শিল্প ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের বিকাশ যে দুর্বার গতি লাভ করে তা দ্রুত পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে যেখানে এই অর্থনীতিই বিজ্ঞান বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদনের বিকাশ বিদ্যমান অর্থনীতির নিয়মে অতি উৎপাদনের সঙ্কটে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ বৈষয়িক জীবনে বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে। বিজ্ঞানের সুফলগুলি ব্যবসার মাধ্যমে বন্টিত হওয়ার নিয়মের কারণে তা ব্যাপক মানুষের প্রয়োজনে মেটাতে পারে না। কারণ ব্যবসার স্বাধীনতা ব্যাপক মানুষের প্রয়োজন পূরণের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে।

বিজ্ঞানের সুফল অর্জন থেকে বঞ্চিত মানুষের কাছে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার, হাতে-কলমে লৌকিক ব্যাখ্যা, ম্যাজিক দেখার সাময়িক আনন্দ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা বৈষয়িক জীবনে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও তার প্রয়োগে সুফল লাভ ব্যাপকের কাছে থেকে যায় কল্পনা মাত্র। আর সুলভে প্রাপ্ত কাল্পনিক অবৈজ্ঞানিক উপায়গুলি তাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। এযুগে প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনকারী আবিষ্কারগুলি আর শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে না। বরঞ্চ পিটার হিগ্‌স, স্টিফেন হকিং-এর ন্যায় বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র রচনা করা সম্ভব হওয়ায় শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। প্রকৃতির রহস্যভেদের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ ব্যবসার পণ্য উৎপাদনে ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিটি বড় বড় কোম্পানি নিজস্ব ল্যাবরেটরি বানিয়েছে বাজারের প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকার পণ্য উৎপাদনের জন্য। অথচ বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জন্য বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের রাজপথে নামতে হচ্ছে।

সুতরাং আজকের দিনে বিজ্ঞান মনস্কতার অর্থ হলো – ব্যাপক মানুষের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল লাভের এবং বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথের বাধাগুলি দূর করা।

এযাবৎ লক্ষ্যণীয় প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও প্রয়োগ শ্রমের হাতিয়ার থেকে যন্ত্রের উন্নতি সেই সমাজে বিদ্যমান উৎপাদক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক অচল হয়ে পরে। সাময়িকভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মন্থর হয়ে পরে। শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নতুন উৎপাদন সম্পর্ক। পুণরায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি গতি লাভ করে। প্রতিটি নতুন সমাজ ব্যবস্থাতেই উৎপাদন পূর্বেকার সমাজের উৎপাদন থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদনের বিকাশ বর্তমানে এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যেখানে সমগ্র মানব সমাজের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। আর তা সম্পন্ন হলেই সমগ্র মানব সমাজ (শ্রেণীহীন) প্রকৃতির রহস্য ভেদে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত হতে পারবে।

স্পষ্টতই বিদ্যমান সমাজের উৎপাদন সম্পর্কটিই এর পরিপন্থী। আগামী সমাজ অর্থাৎ সমাজবাদী সমাজের উপাদানগুলি বিকশিত হয়ে চলেছে বলেই, বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলি সমাজ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবাদী সমাজে, সাধারণের প্রয়োজন মেটানোর অর্থনীতিই মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা ও হতাশার অবসান ঘটাবে। অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার মানব সভ্যতায়, "মিসিং লিঙ্কে"র জীবাশ্মে পরিণত হবে।

সুতরাং বর্তমানে সমস্ত বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ, বিজ্ঞানকর্মী, ও বিজ্ঞান সংগঠনগুলির এক এবং অভিন্ন কর্মসূচী হলো – সমগ্র মানব জাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর পথে বাধা স্বরূপ বিদ্যমান অর্থনীতির পরিবর্তনের সংগ্রামে সামিল হওয়া – যা আসলে সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হওয়া। ■

সমাজ দর্পণ ঃ

১০৬ তম বিজ্ঞান কংগ্রেসে

অবৈজ্ঞানিক দাবী তুলে বিজ্ঞান সমাজকে বেইজ্জৎ করা হল ঃ সরব বিজ্ঞানীমহল ও বিজ্ঞানকর্মীরা

পাঞ্জাবের বে-সরকারী লাভলি প্রফেশনার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ১০৬ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (৩-৭ই জানুয়ারী ২০১৯)। দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী-গবেষক, আমন্ত্রিত কয়েক ডজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী সহযোগে মহাসমারোহমূলক অধিবেশন কিন্তু গত কয়েক বছরের ধারা মেনে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বহির্ভূত কারণে দেশে-বিদেশে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

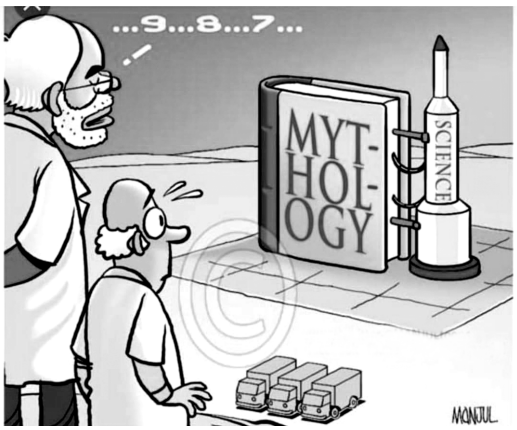

৫ই জানুয়ারী কংগ্রেসের 'Children Science Congress Section' (ছোটদের জন্য বিজ্ঞান কংগ্রেস বিভাগ) এ বক্তব্য পেশ করেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নাগেশ্বর রাও যিনি অজৈব রসায়নের একজন অধ্যাপক। এছাড়াও ঐ বিভাগে বক্তব্য রাখেন গবেষক ডঃ কে. জে. কৃষ্ণণ। এনারা বক্তব্য রাখেন "Meet the Scientists" (বিজ্ঞানীদের সাথে মোলাকাত) অনুষ্ঠানে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরূপে এঁদের ছোট-ছোট ছাত্র ও শিক্ষকদের সামনে বক্তব্য রাখতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্যের সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ-

* কৌরবদের জন্ম হয়েছে 'স্টেম সেল' ও 'টেস্ট টিউব' প্রযুক্তির সাহায্যে।

* ভগবান ব্রহ্মা পৃথিবীতে ডাইনোসরের অস্তিত্ব দেখেছিলেন এবং বেদ-এ তা লিখেও গিয়েছিলেন।

* চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ এর বহু পূর্বে তারই বিকশিত রূপ 'বিষ্ণুর দশাবতার' তত্ত্ব ভারতে প্রচলিত ছিল।

* রাবণের কাছে ২৪ ধরণের বিমান ছিল এবং লঙ্কায় বিমান বন্দরও ছিল।

* ভগবান রাম 'অস্ত্র' ও 'শস্ত্র' ব্যবহার করতেন। ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্যকে ধাওয়া করে ভেদ করার জন্য সুদর্শন চক্র ব্যবহার করতেন। এর থেকে প্রমাণ হয় প্রাচীন ভারতে Guided Missile System (নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা) ছিল।

'গবেষক' কে. জে. কৃষ্ণন মহাশয় এর দাবী বিজ্ঞান সমাজকে স্তম্ভিত করে দিলেও এই সংগঠিত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও স্তরকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বলেন 'মহাকর্ষীয় বল সম্পর্কে আইজাক নিউটনের সামান্যই জ্ঞান ছিল এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' (theory of relativity) দিয়ে দুনিয়াকে বিভ্রান্ত করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করেন এবং বলেন যখন তাঁর তত্ত্ব দুনিয়া গ্রহণ করবে তখন আজ যা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (Gravitational wave) নামে পরিচিত তার নামকরণ হবে **'নরেন্দ্র মোদি তরঙ্গ'** এবং Gravitational lensing (মহাকর্ষীয় লেন্সিং) এর নামকরণ হবে **হর্ষবর্ধন এফেক্ট'**। 'তিনি আরো বলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন আগামী দিনে ডঃ এ. পি. জে আব্দুল কালাম-এর থেকেও বড় বিজ্ঞানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হবেন]

এটাকে আজগুবি প্রলাপ বললে ভুল হবে। ২০১৫ এর মুম্বই কংগ্রেসের পর (যা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত চর্চা হয়েছে) ২০১৬ তে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বলা হয় 'বাঘের চামড়ায় বসলে বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বিপরীতমুখী করা যায়'। ২০১৬ তে বলা হয় - 'ভগবান শিব একজন পরিবেশবিদ ছিলেন', 'শাঁখ বাজালে শরীরের উপকার হয়'। মার্চ ২০১৮ তে ইম্ফল কংগ্রেসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হর্ষবর্ধন দাবী করেন যে স্টিফেন হকিং স্বীকার করে নিয়েছেন বেদে ভর-শক্তি রূপান্তর বিষয়ে আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্রের থেকে উন্নত সূত্র ছিল। সুতরাং একই পরম্পরা জারী আছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (ISCA) বর্তমান সভাপতি জীববিজ্ঞানী মনোজ চক্রবর্তী বিবৃতি দিয়েছেন, আমি গভীরভাবে দুঃখিত যে উনি (নাগশ্বের রাও) এই সমস্ত বক্তব্য বাচ্চাদের সামনে পেশ করেছেন। আমি টিম করে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছিলাম যাতে কোন অবৈজ্ঞানিক দাবী কোন বক্তা না করেন। উপাচার্যের স্তরের কোন ব্যক্তি যখন এই ধরণের কথা বলেন তখন খুবই বিস্মিত হতে হয়। নাগেশ্বর বিজ্ঞানীর অবশ্য তাতে বয়েই গেছে। তিনি তাঁর বক্তব্যে অনড় থেকে বলেছেন রামায়ণ-মহাভারত-পূরাণ নয় – ইতিহাস। আজ আমরা যা বুঝতে অক্ষম তার মানে সেটা বিজ্ঞান নয় এমন বলা যায় না।

ISCA-র সাধারণ সম্পাদক পি. মাথুর বলেন 'আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে বক্তার কাছে প্রমাণের দাবী করতাম।'

ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত প্রখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপক সি. এন. আর. রাও বলেন 'আমি কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকি না পাছে মনে হয় আমি ঐ সব দাবী ও ব্যাখ্যা সমর্থন করছি।'

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কে. বিজয় রাঘবন তাঁর ব্লগে লিখেছেন 'বিজ্ঞানীরা যদি মূর্খের মত কথা বলেন তাহলে তারা সমাজের ক্রোধের মুখোমুখি হবে। এটা সত্যই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা নামী প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যিনি আবার জীববিজ্ঞানী – এমন কথা বলছেন যা বৈজ্ঞানিকভাবে অসমর্থনযোগ্য।

দেশ জুড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা, সংগঠন, বিজ্ঞানকর্মী-গবেষক-অধ্যাপক-ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ সভা প্রদর্শন করেছেন বিজ্ঞান কংগ্রেসকে 'অবৈজ্ঞানিক ছদ্মবৈজ্ঞানিক' বক্তৃতার মঞ্চে পরিণত করার বিরুদ্ধে।

তথ্যসূত্র : টাইম অফ ইন্ডিয়া, নবভারত টাইমস, ইন্ডিয়ান

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

বদলে গেল কিলোগ্রাম

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বাজারে বহু কিছু কিনতে গিয়ে, তার পরিমাণ বোঝাতে যে "ওজন" শব্দটি ব্যবহার করি তা আসলে বস্তুর ভর। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে বিশ্বব্যাপী এই ভর পরিমাপের ব্যবহারিক এককটি হলো "কিলোগ্রাম"। বস্তুর ভর পরিমাপ করতে বানান হয়েছিল – প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম এর এমন একটি বাটখারা-যার কোনো ক্ষয় নেই। ফলে ঐ বাটখারার বয়স নিরপেক্ষভাবে ওর সাপেক্ষে বস্তুর ভর মাপা যাবে নির্ভুল ভাবে। বিশ্বের সকল বাজারে, ভর মাপার প্রচলিত কিলোগ্রামের বাটখারা ঐ মূল বাটখারার ভরের সাপেক্ষেই নির্মিত হওয়ার নিয়ম। যদিও বাজারে ব্যবহৃত বাটখারা গুলি প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম নির্মিত নয়। এই কারণেই আবার বাজারে ভর মাপার বাটখারাগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তন করাই নিয়ম।

কিন্তু কিলোগ্রামের এই মূল বাটখারা যার নাম "Le Grande K বা Big K" খুব সাবধানে সংরক্ষিত থাকলেও, ধরা-মোছার সময় এর কিছু পরিমাণ পরমাণু কমে যাচ্ছে। ফলে অতিসূক্ষ্ম হলেও মূল বাটখারার ভর কমে যাচ্ছে। এই কারণে ২০১৮ সালের ১৬ই নভেম্বর প্যারিসের কাছে ভার্সেই শহরে ৫০টিরও বেশি দেশের বিজ্ঞানীদের ভোটে ভর মাপার মূল বাটখারা – Le Grande K: কে বাতিল করে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের ভিত্তিতে এক কিলোগ্রাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।■

সমাজ দর্পণ ঃ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস – কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'I attended one day (of an earlier Congress) and very little science was discussed. It was a circus. I find that it's an organisation where very little science is discussed. I will never attend a science congress in my life.' **(আমি পূর্বের একটি কংগ্রেসে একদিন যোগ দিয়েছিলাম এবং বিজ্ঞানের বিষয়ে অতি অল্পই আলোচনা হয়েছিল। সেটা এক সার্কাস ছিল। আমি এই সংস্থাকে এভাবেই দেখছি যেখানে বিজ্ঞান অতি অল্পই চর্চিত হয়। আমি জীবনে আর কখনো বিজ্ঞান কংগ্রেসে উপস্থিত হব না।)** – ভেঙ্কটরামণ রামকৃষ্ণণ[১] ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (মহীশুর ২০১৬)-এ কেন উপস্থিত হননি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। [তথ্যসূত্র : টাইমস অফ্ ইন্ডিয়া জানুয়ারী ৬, ২০১৬]

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন (ISCA – ইস্কা) সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য পেশ করে নেওয়া প্রয়োজন। ইস্কার যাত্রা শুরু ১৯১৪ সালে ঔপনিবেশিক ভারতে। সদর দপ্তর কলকাতায়। মুখ্যতঃ ব্রিটিশ রসায়নবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. এল. সিমোনসেন এবং অধ্যাপক পি. এস ম্যাকমোহনের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ধাঁচে বাৎসরিক সম্মেলন-এর মাধ্যমে গবেষকদের উৎসাহ দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। বর্তমানে ৩০,০০০ এর বেশি বিজ্ঞানী ইস্কার সদস্য, প্রতি বছর ২রা থেকে ৭ই জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ইস্কার উদ্যোগে। এছাড়াও ভারতে বিজ্ঞানের প্রসার ও বিকাশ, বিজ্ঞান জার্নাল ও সম্পর্কিত প্রকাশনা ইস্কার ঘোষিত উদ্দেশ্য। বর্তমানে বিজ্ঞান কংগ্রেস এর অধিবেশনে গোটা ভারতের সমস্ত শাখার বিজ্ঞানীরা উপস্থিত হন। তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে নির্বাচন করে পুরস্কার দেওয়া হয়। বিদেশ থেকেও অনেক বিজ্ঞানী (প্রতিবছর যার মধ্যে বেশ কিছু নোবেল প্রাপক থাকেন) আমন্ত্রিত হন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট বিষয়ভাবনা বা Theme থাকে অধিবেশনের। যেমন সদ্য অনুষ্ঠিত (৩-৭ জানুয়ারি ২০১৯) ১০৬ তম কংগ্রেসের থীম ছিল ঃ "ভবিষ্যৎ ভারত ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি"। বিষয়টা বিজ্ঞান বলে প্রচার মাধ্যমে তুমুল হৈচৈ না হলেও বর্তমানে এই অধিবেশন সংশ্লিষ্ট মহলে রাজসূয় যজ্ঞের মত।

গত কয়েকবছর ধরে বিজ্ঞান কংগ্রেস নিয়ে যেটুকু আলোচনা হচ্ছে তা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এবং সেটা কেবলমাত্র ঐ অধিবেশনে সীমাবদ্ধ নয়। ভিন্ন কারণটা হল বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে, অধিবেশনের বাইরে – যত্রতত্র 'বিজ্ঞানী', সরকারী শিক্ষা-বিজ্ঞান বিভাগের কর্তাব্যক্তি, মন্ত্রীমহাশয় ও রাজনৈতিক নেতারা – একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 'আজগুবি, অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য হাজির করছেন'। নির্দিষ্ট লক্ষ্যটা হল এটা প্রমাণ করা যে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত কিছুই প্রাচীন ভারতে আবিস্কৃত হয়েছিল ও প্রযুক্ত হত। পশ্চিমী দেশগুলির বৈজ্ঞানিকরা সে সব বহু পরে পুনরাবিষ্কার করেছেন মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞানের ইতিহাস পুনর্লিখন দরকার।

যে সমস্ত বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মী-বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি ও সংগঠন 'সরকারী' মতের বিরোধিতা করছেন তাঁদের অধিকাংশের বক্তব্য হল এই সংগঠিত-উদ্দেশ্যমূলক প্রচার আসলে সংঘপরিবার (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ – RSS ও তার দ্বারা পরিচালিত বা প্রভাবিত সংগঠন-সংস্থাসমূহ) এর শিক্ষায় 'গেরুয়াকরণ' এর পদক্ষেপ। অন্যদিকে যাঁরা এই 'সরকারী' মতের পক্ষে তাঁদের বক্তব্য হল যারা বিরোধিতা করছে তারা ঔপনিবেশিক ও পশ্চিমী চশমা ব্যবহার করে। "ভারতীয় জ্ঞান তন্ত্রের ঐতিহ্যকে এখনো পর্যন্ত অধ্যয়ন করা হয়নি। একবগ্গা ধ্যান ধারণার কারণে উপযুক্ত অধ্যয়ন ও গবেষণা ছাড়াই এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার

---

১. ভেঙ্কটরমণ রামকৃষ্ণণ ঃ বর্তমানে রয়াল সোসাইটির (লন্ডন) সভাপতি। বিশ্বখ্যাত স্ট্রাকচারাল বায়োলজিস্ট। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত রাজ্য (UK)র নাগরিক। ২০০৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান (থমাস স্টীভজ ও আফা যোনাথ এর সাথে যুক্তভাবে)। বিষয় ছিল 'রাইবোজোম এর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোকপাত'। জন্ম - ১৯৫২ সালে তামিলনাড়ুতে।

করা হয়েছে। ...” – অনিল সহস্রবুদ্ধে [চেয়ারম্যান – অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE)।

আলোচনার শুরুতে বিতর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যগুলোর কয়েকটা সামনে রাখা যাক।

প্রাচীন ভারতীয় উড়ান প্রযুক্তি (Ancient Indian Aviation Technology)

১০২ তম বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্‌কালে ডিসেম্বর ২০১৪ তে ঘোষণা করা হয় ‘সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান’ শীর্ষক সিম্পোজিয়মে কেরালার পাইলট ট্রেনিং স্কুলের অধ্যাপক আনন্দ বুদাস (এবং সহকারী রূপে অমেয় যাদব - স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ও জুনিয়ার কলেজের অধ্যাপক) একটি পেপার পেশ করবেন প্রাচীন ভারতীয় উড়ান প্রযুক্তি বিষয়ে। সেই পেপার-এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই বিজ্ঞানীমহল থেকে প্রতিবাদ ওঠে। যাই হোক কংগ্রেসে ৩০ মিনিট ধরে যে পাঠ পেশ করা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

প্রাচীন ভারতে (৭০০০ বছর বা তারও আগে) সংস্কৃত সাহিত্যে উড়ান যন্ত্র (flying machine) এর ভরপুর বর্ণনা আছে। ‘বৈমানিকা প্রকরণম’ (বা বৈমানিকা শাস্ত্র) থেকে এটা স্পষ্ট যে ঋষি অগস্ত্য ও ঋষি ভরদ্বাজ উড়োজাহাজ নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমান বিমান কেবল দেশ থেকে দেশে, মহাদেশ থেকে মহাদেশে যেতে পারে কিন্তু প্রাচীন বিমান গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে পারতো। এই বিমান মাঝ আকাশে দাঁড়াতে পারতো। তারপর সামনে-পিছনে – যে কোন পাশে ফের চলতে পারতো। এই শাস্ত্রে চার ধরণের বিমানের উল্লেখ আছে। যেমন শকুনা বিমান। এটা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, পারদ, সোহাগা, অভ্র, রূপা ও পঞ্চামৃত দ্বারা প্রস্তুত। সুন্দর বিমানে গরু-হাতির মূত্র কে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা হত। ত্রিপুরা বিমান আকাশ-মাটি-জল সর্বত্রই চলতে পারতো। আরো বলা হয়েছে ২৪ ধরণের ভাইরাস যা বায়ুমন্ডলে আছে এবং মানব ত্বক, হাড় ও সম্পূর্ণ শরীরকে আক্রমণ করে এই সত্যে উপনীত হয়ে ঋষি ভরদ্বাজ বিমান চালকদের উপযুক্ত পোশাক নির্ধারণ করেছিলেন যা ভাইরাস নিরোধক, জল নিরোধক এবং আঘাত নিরোধক।

এই অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী (বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী) প্রকাশ জাভড়েকর মহাশয় বলেন “প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ উপযুক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম ছাড়াই কয়েক শতাব্দী ব্যাপী নিবিড় নিরীক্ষণ, অভিজ্ঞতা আর যুক্তিকে একত্রিত করে উৎকর্ষে পৌঁছেছিল। সেই জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।”

অধিবেশনের আগেই বিষয়বস্তু প্রচারের সাথে সাথেই NASA Ames Research Center এর গবেষক রামপ্রসাদ গান্ধীরামণ এই পেপার যাতে বিজ্ঞান কংগ্রেসে পাঠ না করা হয় তার জন্য অনলাইন পিটিশন শুরু করেন। বহু বিজ্ঞানী-গবেষক তাতে সাড়া দেন। বিজ্ঞানের সাথে পুরাণকে গুলিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

কিন্তু বিষয়টা বিজ্ঞান কংগ্রেসে থেমে থাকেনি। ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিংহ বলেন ‘আই. আই. টি ছাত্রদের পুষ্পক বিমান এর বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। এটা হল উড়ন্ত রথ বা বিমান যা রাবণ সীতাকে হরণ করতে ব্যবহার করেছিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডিপ্লোমা প্রাপকদের সভায় তিনি আরো বলেন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় দ্বারা বিমান আবিষ্কার হয়নি। তার ৮ বছর আগে ১৮৯৫ সালে মুম্বইয়ের চৌপট্টির আকাশে বিমান উড়িয়েছিলেন শিবকর বাপুজী তালপাড়ে। প্রসঙ্গত সিংহ মহাশয় আরো বলেন ‘সেই রাক্ষসরাজ বারণ এর সাম্রাজ্যে গাছপালায় জল দেওয়া হত না কারণ তারা পৌরাণিক ঔষধি বা সুধা (mythical elixir)‘চন্দ্রমণি’ ধারণ করতো। এখানেও না থেকে এটা সত্যসত্যই পাঠ্যসূচীর অঙ্গীভূত করা হল, AICTE ইঞ্জিনীয়ারিং এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ‘প্রাচীন জ্ঞান তন্ত্র’ (Ancient knowledge system) নামে একটি ঐচ্ছিক বিষয় চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় ২০১৮ এর দ্বিতীয়ার্ধে। এই পাঠ্যসূচীর রেফারেন্স বই হিসেবে ভারতীয় বিদ্যা ভবন দ্বারা প্রকাশিত ‘ভারতীয় বিদ্যা সার’কে সুপারিশ করা হয়। ঐ পাঠ্যপুস্তকে দাবী করা হয়েছে ‘ঋষি অগস্ত্য তড়িৎ ভোল্টীয় কোষ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনিই তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জল (H_2O) থেকে হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন (O_2) প্রস্তুত করেন। গতির সূত্র আইজাক নিউটনের নামাঙ্কিত অথচ ‘বৈষেশিক সূত্র’ তে ঋষি কর্ণাদ গতির রূপ আবিষ্কার করেন। ‘বৈমানিকা শাস্ত্র’ সম্পর্কে পূর্বোক্ত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে ঋকবেদে আলোর গতিবেগ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা আছে। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বও ঋকবেদে প্রথম পেশ করা হয়।

একইভাবে এই তথ্য প্রকাশ হবার সাথে সাথে হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন, মুম্বই এর বিজ্ঞানী ও ফ্যাকাল্টী সদস্য অনিকেত সুলে AICTE এর চেয়ারম্যান শ্রী সহস্রবুদ্ধের কাছে অনলাইন প্রতিবাদপত্র পেশ করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন যা বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মী-ছাত্র মহলে প্রভূত সাড়া ফেলে। এই প্রতিবাদপত্রে লেখা হয় “কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ‘ভারতীয় বিদ্যা

সার' পুস্তকটিকে অনুমোদন দেওয়ার সংবাদে আমরা অবাক হয়েছি। ... বস্তুতঃ এ ধরনের পুস্তক প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করার বদলে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব প্রচার করে তথা নির্ভেজাল মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে ক্ষতি করছে।..." প্রসঙ্গত শ্রী বুদাস মহাশয় প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকদের জানান যে বিমান শাস্ত্র-সময়ের সাথে সাথে ও ভারত ভূখন্ডে বিদেশী শাসনের কারণে অর্জিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেই জ্ঞানই পশ্চিমীদের দ্বারা হস্তগত করা হয়।

অনিকেত সুলের এই প্রতিবাদ পত্র জারী হবার সাথে সাথে ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং পুস্তকটির অন্যতম লেখক শশীবালা এক পাল্টা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালু করেন যার শীর্ষক হল "ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রকে জানার অধিকার"। বিদ্যা ভবনের নির্দেশক অশোক প্রধান বলেন যে 'এই পাঠক্রম বৈদেশিক আক্রমণ ও উপনিবেশকরণের কারণে চিরকাল অবহেলিত হয়ে এসেছে।' অন লাইন স্বাক্ষর পত্রটিতে বলা হয়েছে ভারতীয় বিদ্যাসার সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিদ্বেষী, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য এই বিদ্বেষীদের জবাব দেওয়া উচিত।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে পেপার উপস্থাপন করা, পাঠ্যপুস্তকে জুড়ে দেওয়ার পর সভা-সমিতি করেও প্রচার করা হচ্ছে বিমান শাস্ত্রে প্রাচীন ভারত হল পথিকৃৎ। গত ৯/০৯/২০১৮ মুম্বইয়ের দাদারে 'বিমান শাস্ত্র' এর উপর সভার আয়োজন করা হয়। সোস্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করা হয়। অনিকেত সুলে সহ হোমি ভাবা সেন্টারের তিনজন বিজ্ঞানী সভায় গিয়ে দেখেন যে আয়োজক 'ভারতম রিঅ্যাওয়েকনিং' এর উদ্যোক্তারা নিজেরা বিজ্ঞানী। যেমন ডঃ প্রহ্লাদ রামা রাও – পূর্ব উপাচার্য ডিফেন্স ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স টেকনোলজি (DIAT) এবং DRDO র প্রাক্তন চিফ কন্ট্রোলার। দর্শক আসনে বসে যখন আলোচকদের প্রশ্ন করা হয় প্রাচীন ভারতে কোন্ জায়গায় পারদ উৎখনন করা হত বা গাধার মূত্র ব্যবহার করে এখন একটা গাড়ি চালিয়ে দেখানো যাবে কিনা, তখন কার্যত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাদের সভাগৃহ থেকে বার করে দেবার চেষ্টা হয়।

বৃহৎ বৈমানিকা শাস্ত্র সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে ১৯৭৪ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স – IISC বেঙ্গালুরুর Department of Aerospace and Mechanical Engineering বিভাগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা (এইচ. এস. মুকুন্দ, এস. এম দেশপান্ডে, এ. প্রভূ, এইচ. নগেন্দ্র এবং এস. পি. গোবিন্দরাজু – যারা সকলেই সংস্কৃত অধ্যয়নে দক্ষ) গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। যা প্রকাশিত হয়েছিল SCIENTIFIC OPINION-1974 জার্নালে। শাস্ত্রটির মূল সংস্কৃত ও হিন্দী-ইংরেজী অনুবাদ পড়ে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন এই শাস্ত্র আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানকে অস্বীকার করে, নিউটনের গতিসূত্রকে সম্পূর্ণ উল্লঙ্ঘন করে। যে বিমানগুলির রূপ চিত্রণ করা আছে তাদের কারও আকাশে উড়বার ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য নেই। এছাড়া জ্যামিতি, নির্মাণসামগ্রী, রসায়ন, কারিগরী তথ্যাদি কোন দিক থেকেই এই বিমানের কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই।

গবেষণাপত্রের অন্যতম লেখক অধ্যাপক এস. এম. দেশপান্ডে মুম্বইতে বিজ্ঞান কংগ্রেসে উক্ত বিতর্কের পরে দ্য হিন্দুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন **"আমরা যখন ঐ উড়ান বিজ্ঞান শাস্ত্র সংস্কৃততে অধ্যয়ন করি তখন সেটা করেছিলাম গভীর বৈজ্ঞানিক উৎসুকতা থেকে ঐ 'শাস্ত্রকে' ছদ্মবিজ্ঞান প্রমাণ করে নস্যাৎ করার কোন আকাঙ্ক্ষা মনে ছিলনা। আমরা গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত ঐ শাস্ত্র ঋষি ভরদ্বাজের লেখা নয়। ঐ শাস্ত্র কোনভাবেই ১৯০৪ এর আগে লেখা হতে পারে না। এটি আনেকাল এর সুব্বারায়া শাস্ত্রী দ্বারা লিখিত।"**

সুতরাং ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। এই অধ্যায় শেষ করা যায় পাগলা দাশুর উদ্ধৃতি দিয়ে – 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া'! কারণ ২০১৯ বিজ্ঞান কংগ্রেসেও এই দাবী থামেনি।

২

চিকিৎসা বিজ্ঞান (প্লাস্টিক সার্জারী ও অন্যান্য বিষয়)

মুম্বই বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্য অধিবেশনে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসক অশ্বীন সাত্তয়ন্ত বলেন – খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে ভারতে আধুনিক অস্ত্রোপচার হত যা ঋকবেদে লেখা আছে। আমরা সবই তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলছি। তাঁরা মস্তিষ্কে, চোখে অস্ত্রোপচার করতেন, কাটা অঙ্গ জোড়া লাগানো – Reconstructive Surgery, করতেন। ক্ষতিগ্রস্ত অক্ষি-গোলক তুলে ফেলতেন। মাতৃজঠর থেকে মৃত ভ্রূণ এমনকি মৃত মাতার গর্ভ থেকে জীবন্ত ভ্রূণ বার করে আনতে পারতেন। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান গৌরী সহুলিকর বলেন অনেকে সংস্কৃতকে ধার্মিক ও দার্শনিক ভাষা রূপে দেখে কিন্তু সংস্কৃত হল Language of Science – বিজ্ঞানের ভাষা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে শব ব্যবচ্ছেদ ও ময়না রিপোর্টের উল্লেখ আছে। সুশ্রুত বলেছেন একটি মৃতদেহকে তিন দিন নদীতে ভাসিয়ে রাখলে তা ফুলে ওঠে এবং সমস্ত পেশী ও স্নায়ুগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০ ধরনের তীক্ষ্ণ আর ১০১ ধরনের ভোঁতা সরঞ্জামের তালিকা আছে।

এই দাবীর সূত্রপাত অবশ্য বিজ্ঞান কংগ্রেসে হয়নি। অক্টোবর ২০১৪ তে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুম্বইতে রিলায়েন্স হাসপাতালের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন 'প্রাচীন ভারত বিজ্ঞান জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। মহাভারত বলে কর্ণ মাতৃগর্ভ থেকে জন্মাননি। অর্থাৎ তখন লোকে জেনেটিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। ভগবান গণেশের মাথায় হাতির মুন্ড লাগানোর জন্য তখন নিশ্চয়ই প্লাস্টিক সার্জেন ছিল।'

এরকম আরো কিছু দাবী নিম্নপ্রকার ঃ

১) হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল আচার্য্য দেব ব্রাট বলেছিলেন বিদেশী গরু যেমন হোলস্টেইন ফ্রেইসিয়ান, জার্সি ইত্যাদি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। এটা উগ্রতা ও উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে, আচার্য্য মহাশয়ের হরিয়াণার কুরুক্ষেত্রে ২০০ একরের কৃষি ফার্ম আছে। তিনি দীর্ঘ গবেষণা করে দেশী গরুর গোবর ও মূত্র থেকে প্রস্তুত দেশীয় সার – জীব অমৃত প্রস্তুত করেছেন। এই অমৃত নিজে থেকে কেঁচোর বংশবৃদ্ধি করে উর্বরতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। একটি মাত্র দেশী গরু ৩০ একর জমির জন্য জীব অমৃত তৈরী করে কিন্তু ৩০টা জার্সি/হোলস্টেইন গরু মাত্র ১ একরের উপযুক্ত সার তৈরী করে। তাঁর নির্দেশে হিসার-কুরুক্ষেত্র-নৈনী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে ১ গ্রাম দেশী গরুর গোবরে ২-৫ লাখ কোটি উর্বরতাবৃদ্ধিকারী জীবাণু আছে। যেখানে বিদেশীতে মাত্র ৬০-৭০ লাখ প্রতি গ্রাম।

২) উত্তরাখন্ড বিধানসভা প্রস্তাব পাশ করে যে গরুকে 'রাষ্ট্রমাতা'র মর্যাদা দেওয়া হোক এই প্রস্তাব কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানো হবে। সর্বসম্মতিতে পাশ হওয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী রেখা আর্য বলেন "গরু একমাত্র প্রাণী যে প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করেনা কিন্তু নিঃশ্বাসের সাথে অক্সিজেন ছাড়ে।..."

৩) জুনাগড় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর বায়োটেক বিজ্ঞানীরা গোমূত্র ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করেছেন তাদের প্রথম চেষ্টায়। অধ্যাপক শ্রদ্ধা ভাট, রূপম সিংহ তোমর ও গবেষক কবিতা যোশী একবছরের পরীক্ষায় এই ফল পেয়েছেন। অধ্যাপক ভাট বলেন 'খুবই ঝুঁকিপূর্ণ গবেষণা ছিল কারণ আমরা সরাসরি বোতলে ভরা ক্যানসার কোষ নিয়ে গবেষণা করেছিলাম। আমরা গোমূত্রের সঠিক মাত্রা খুঁজে পেয়েছি যা দিয়ে একদিনে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্যানসার কোষকে মেরে ফেলা যাবে। মুখ-ফুসফুস-ত্বক-কিডনী-স্তন ক্যানসার এর ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী। এর পরবর্তী পদক্ষেপ 'ইঁদুরের উপর পরীক্ষা। সেটা সফল হলেই আমরা বিভিন্ন ধরণের ক্যানসারের জন্য খাবার বড়ি তৈরী করবো।' অধ্যাপক তোমর বলেন কেমোথেরাপি সুস্থকোষকেও ধ্বংস করে কিন্তু গোমূত্র কেবল সংক্রামিত কোষকে মারে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতটা উল্লেখ না করলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। ভি. রাধাকৃষ্ণ (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মেডিসিন অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি) জানান – গোমূত্র ক্যানসার নিরাময় বা প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মজুত নেই। আমি বা আমাদের সহযোগী অঙ্কোলজিস্টরা এমন কাউকে পাননি যারা কেবল গোমূত্র ব্যবহার করে ক্যানসারের সফল চিকিৎসা করেছেন। বাস্তবে গোমূত্রের সাথে মানুষের মূত্রের মৌলিক কোন তফাৎ নেই। ৯৫% H_2O (জল), সোডিয়াম-পটাশিয়াম-ফসফরাস-ক্রিয়াটিনিন-এপিথেলিয়াল কোষ – এরা কেউই ক্যানসার প্রতিরোধক নয়। একই বক্তব্য ও যুক্তিজাল বিস্তার করা হল সদ্যসমাপ্ত ১০৬ তম বিজ্ঞান কংগ্রেসে। যেখানে বলা হল গান্ধারী স্টেম সেল প্রযুক্তি ও টেস্ট টিউব প্রযুক্তির সাহায্যে একশত সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

সুতরাং এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয় যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে পরীক্ষাগার, স্কুল-কলেজ থেকে বিধানসভা-লোকসভা, সভা সমিতি থেকে সংবাদ মাধ্যম – সর্বত্র একই সরলরৈখিক যুক্তি বিস্তার করে একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য বৈজ্ঞানিক সত্য রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। মেঘনাদ সাহার থেকে ধার নিয়ে বলা যায়।**'সবই ব্যাদে আছে।'** সুতরাং বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণ করা বা ভারতে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এই সংগঠিত প্রচারের উদ্দেশ্য নয়।

বস্তুতঃ এ ধরণের প্রমাণ রহিত, ক্ষেত্রবিশেষে হাস্যাস্পদ যুক্তি জাল কোন অবৈজ্ঞানিক 'শক্তি'র সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিলে প্রাচীন যুগে সমসময়ের সাপেক্ষে ভারতে বিজ্ঞানের বিকশিত ইতিহাসকেই তাচ্ছিল্য করা হয়।

মুম্বই কংগ্রেসে প্লাস্টিক সার্জারী সম্পর্কে যা উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে কাল বা সময়ের কোন গুরুত্বই নেই। সুশ্রুত সংহিতা এক ঐতিহাসিক বিষয় যার সাথে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দের কোন সম্পর্ক নেই। এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে প্রাচীন মিশরে বিচ্ছিন্ন অংগ জোড়া লাগানোর উল্লেখ আছে (খ্রীঃপূর্ব ২৫০০-৩০০০)। বর্তমান পশ্চিমী দেশের আগে ভারত ভূখন্ডে এধরণের অস্ত্রোপচারের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐতিহ্যের জয়গান করতে গিয়ে যখন মৃতদেহ থেকে জ্যান্ত ভ্রূণ বার করার তথ্য দেওয়া হয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তখন সেটা আজগুবি উন্মত্ত আচরণে

পর্যবসিত হয়। সেই উন্মত্ততার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় যখন যে কোন প্রশ্ন – যা অস্বস্তিকর তাকেই সংস্কৃতি বিরোধী ঐতিহ্যবিরোধী বলে দেগে দেয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বার বার প্রমাণ দিয়ে যেতে হয়। প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। সেই তত্ত্বের প্রবক্তা ঋষি-মুনি হোন বা নিউটন-আইনস্টাইন।

দ্বিতীয়তঃ কোন প্রযুক্তি যদি কোন সময় বর্তমান থাকে তবে কোন না কোন ভাবে তার ধারাবাহিকতা থাকে – ক্ষণকালের ছেদ সত্ত্বেও। কারণ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা প্রযুক্তির প্রতিরূপ (Replica) অন্যের দ্বারাও তৈরী করা সম্ভব, এ ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণণ এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। "The idea that Indian had aeroplanes 2000 years ago sounds almost essentially impossible to me. I don't believe it. The point is that if the technology was produced in a method so described that anybody could replicate it, then it becames - Science" (২০০০ বছর আগে ভারতে উড়োজাহাজ ছিল এটা আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়। আমি এটা বিশ্বাস করি না। মূল বিষয় হল, কোনো প্রযুক্তি বর্ণিত যে পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে সেই পদ্ধতিতে অন্য যে কেউ যদি তার প্রতিরূপ (Replica) তৈরী করতে সক্ষম হয় তবেই সেটি বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হবে।) সমগ্র বিতর্কের অন্য দিক বা পরিণামটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবৈজ্ঞানিক-ছদ্মবৈজ্ঞানিক যুক্তি জাল বিস্তার করা। জবরদস্তি তাকে আঁকড়ে ধরে বিরুদ্ধমতকে গালাগাল দেওয়া, এই প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাহায্যকারীর ভূমিকা রাখা সমগ্র পরিবেশটাকেই কলুষিত করে দেয়। যারা বিরোধিতা করেন তাঁরাও সেই জালে জড়িয়ে পড়েন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধরে নেন 'সব ঝুট হ্যায়'। এই চিন্তাধারাও বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং বিপরীতভাবে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করে। 'নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট বিশ্লেষণই বিজ্ঞান দাবী করে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগে (ভারতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত) ভারতের বিকাশ সত্যই নতুন নতুন দিগন্ত স্পর্শ করেছিল। যা এক স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের পূর্ব সভাপতি যেমন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৯২০), রাম নাথ চোপড়া (১৯৪৮) এবং অন্যান্যরা বিজ্ঞানের বিকাশে ভারতের অবদান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শিক্ষাদান করে গেছেন। বর্তমানের আজগুবি দাবীর পরিবেশ সেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্পর্কেই যাতে নেতিবাচক মনোভাব না তৈরী করে সে দিকেও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি ও সংগঠনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আমাদের সময়ে এই দেশের অগ্রগণ্য মহাবিশ্বতাত্ত্বিক প্রফেসর জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকর এর বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ – "... পশ্চিম দুনিয়াও গণিতে ভারতীয় জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়। আমরা যদি আজগুবি দাবী করতে শুরু করি তাহলে আর বিশ্বের বিজ্ঞান সমাজ সেই দৃষ্টিতে আমাদের দেখবেনা।" প্রফেসর নার্লিকরের বক্তব্য এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করেছেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণন (যদিও ভিন্ন প্রসঙ্গ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে) : "We are all human beings and our nationality is simply an accident by birth ... It's not about where you were born or where you come from that makes you a good scientist. What you need are good teachers, co-students, facilities ... Science is curiosity, testing and experimenting ... Science is an international enterprise where discoveries in one part of the world are useful in other parts. Science today is a highly collaborative exercise and to convert it into a contest, as the NOBEL does, is a bad way to look at Science ... A culture based on superstitions will do worse than one based on scientific knowledge and rational thought."

(আমরা সকলেই মানুষ এবং আমাদের জাতীয়তা আসলে জন্মগ্রহণ জনিত দুর্ঘটনা। ... আমরা কোথায় জন্মেছি বা কোথা থেকে এসেছি তার দ্বারা ভাল বিজ্ঞানী হওয়া নির্ভর করে না। আমাদের প্রয়োজন ভাল শিক্ষক, ভাল সহপাঠী এবং ভাল সুযোগ-সুবিধা। ... বিজ্ঞান হল অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা এবং পরীক্ষণ ... বিজ্ঞান এক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যেখানে পৃথিবীর এক দিকে করা আবিষ্কার অন্যদিকে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে ... আজকের বিজ্ঞান হল উচ্চমাত্রার সহযোগিতামূলক অনুশীলন। একে প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত করা – যেমন নোবেল করে – বিজ্ঞানকে দেখার ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ... কুসংস্কারের ভিত্তিতে তৈরী সংস্কৃতি – বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারার থেকে নিকৃষ্ট।")

পরিশেষে বিজ্ঞানের জগতে অবিজ্ঞান-ছদ্মবিজ্ঞানের আক্রমণ তখনই রোখা সম্ভব যখন প্রতিবাদ – অনলাইন দাবীপত্রের সীমাবদ্ধতা ছেড়ে মাঠে ময়দানে নেমে আসবে। সে কাজ বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্র-ছাত্রী-যুবসমাজ ও অন্যান্যদের। সেই কাজ সফল করতে গেলে সাধারণ শ্রমজীবি জনগণকে বিজ্ঞান সচেতন করার কঠোর প্রয়াস অবশ্য প্রয়োজন।■

সমাজ দর্পণ ঃ

মেঘালয়ের ‘বে-আইনী’ কয়লা খাদানে ১৫ জন শ্রমিকের সলিল সমাধি

ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য মেঘালয়ের (জয়ন্তিয়া পাহাড়) এক বে-আইনী কয়লা খনিতে নদীর জল ঢুকে ১৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হল গত ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৮। দুর্ঘটনার ঠিক দুই সপ্তাহ আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা এবং রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি) ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে খনিগুলি বন্ধ করে দেওয়ার পরও তা যে রমরম করে চলছিল যে বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টকে জানান হয়েছিল যে কয়লার স্তুপ এলাকায় জমা হয়ে রয়েছে তা এন জি টি দ্বারা অবৈধ ঘোষণার পূর্বেই নাকি তোলা হয়েছিল, খননকাজ নাকি বন্ধ আছে! গত ১৩ই ডিসেম্বরের দুর্ঘটনা সরকারের বক্তব্য কতটা মিথ্যা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

রাজ্যের এই ‘র‍্যাট হোল মাইন’এ কয়েক দশক ধরে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। ১৯৯২ তে ২০ জন শ্রমিক একইভাবে জলে ডুবে মারা গেছিলেন দক্ষিণ গারো পাহাড়ে, অনেকে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন, অনেকের খোঁজ মেলেনি। প্রতিদিনকার ছোটখাট দুর্ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়নি, বে-আইনী এই খাদানে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলে ঠিকেদার-মালিকের দায় থাকে না। বেশি হইচই হলে কাজ বন্ধ হয়ে শুকিয়ে মরার ভয়ে শ্রমিক পরিবারগুলিও কোন হইচই করে না।

এই ঘটনা শুধু মেঘালয়ের নয় পশ্চিমবাংলার রাণীগঞ্জ-আসানসোল, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা সর্বত্র এরকম অসংখ্য বে-আইনী কয়লাখাদান চলছে বিপজ্জনকভাবে, সুরক্ষার বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা ছাড়াই আদিম পদ্ধতিতে। গত ২৩শে জানুয়ারি ২০১৯ ধানবাদে ১৪ জন এবং ২৫শে জানুয়ারি রানীগঞ্জে ৩ জন শ্রমিক একইভাবে বেআইনী কয়লাখনি ধ্বসে মারা গেছেন। পেটের দায়ে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জীবন হাতে নিয়ে এখানে কাজ করে আর কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে মন্ত্রী-অফিসার-প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি-রাজনৈতিক নেতা-পুলিশ সকলে।

মেঘালয়ের এই দুর্ঘটনার পর **‘র‍্যাট হোল মাইনিং’** শব্দটার খুব প্রচলন হয়েছে। এই ‘র‍্যাট হোল মাইনিং’ কী? মেঘালয়ের খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে রয়েছে টার্শিয়ারি যুগের প্রচুর কয়লা এবং চুনাপাথর। এই কয়লা ও চুনাপাথর (তার সাথে বেলে পাথর এবং কাদাপাথর) ভূমির সাথে সমান্তরালে স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে থাকে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে আইনীভাবে বেশ কিছু ‘খোলা মুখ খনি’ও (Open cast mine) আছে। তার পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ৮-১০ বর্গফুটের, ভূমির সাথে প্রায় সমান্তরাল খনি। পাহাড়ের গা থেকে কয়লার স্তর ধরে ফুটো করে কয়লা কেটে বের করে আনা হয় আর কয়লার স্তর বা ‘সিম’ বরাবর গর্ত ভেতর দিকে এগিয়ে যায়। এক একটা এরকম খনিতে একজন বা বড়জোড় দুই জন ঢোকে। সুরঙ্গ লম্বা হলে ছোট রেল বসিয়ে মাল আনার ছোট হাতগাড়িতে শ্রমিকরা কয়লা কেটে বোঝাই করে গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসে। পাহাড়ের গায়ে এরকম অসংখ্য সুরঙ্গ দূর থেকে দেখলে ইঁদুরের গর্ত বলে ভ্রম হতে পারে। এই কারণে এগুলিকে ‘র‍্যাট হোল মাইনিং’ বলে। বেসরকারী সমীক্ষা অনুসারে এই ‘র‍্যাট হোল মাইনিং’ দ্বারা দৈনিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন হচ্ছে।■

মেঘালয় পাহাড়ের এক ইঁদুরের কথা

– প্রান্তিক দাস

সামনেটা ঘোর অন্ধকার। কেমন সে অন্ধকার? বলা যায় না। তিন-চার ফুট এর একটা সুড়ঙ্গ। চার হাত পায়ে হাঁটু ছেঁচড়ে ভেতরের দিকে যাচ্ছে একজন। কত বয়স? ১৫ হতে পারে। ২৫ বা তার একটু বেশি। ঠেলে ঠেলে সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছে গাঁইতি আর বেলচা। মাথায় বাঁধা টর্চ। যত ভেতরে ঢোকে ভিজে কয়লার গন্ধে বুক ভরে ওঠে। খুব ভোরে সে এই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে। পৌঁছে যায় শেষ মাথায় সুড়ঙ্গের চালে পিঠ ঠেকিয়ে গাঁইতি দিয়ে সুড়ঙ্গের গায়ে আঘাত করে। ভাঙা কয়লা জড়ো হয় বেঁটে হাত গাড়িটায়। এভাবে কয়লা কেটে যায় যতক্ষণ পারে, যতক্ষণ না খিদে পায়, তেষ্টা পায়। তবু কাজ করে যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় হাজরী ওঠে। এভাবেই তার বাবা কাজ করতো। ঘোর কালো সুড়ঙ্গটা বাবাকে খেয়ে নিয়েছে। তার পরও তার মা মাত্র ৭ বছর বয়সে তাকে নিয়ে এসেছিল এই সুড়ঙ্গের এলাকায়। মা তাকে বড় ভালবাসে। সেও। তিনটে ভাই বোন। সে আর কাউকে এই কালো গর্তে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু যদি কাল চাল ধ্বসে! যদি জল ঢুকে যায়! যদি সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে যায়! জানে না, জানতে চায়ও না। কি হবে জেনে? যদি এই কালোটা তাকে না নেয় তবুও কি সে বেশি দিন বাঁচতে পারে? তারা কি বেশি বছর বাঁচে? সে জানে হয়ত ২৫ কি ৩০ কিলোমিটার দূরে ৩৫০ ফুট জলে আজ দেড় মাস ধরে ভেসে আছে তার মত ১৫ টা! তারা কি হতভাগা? না গো তারা বড়ই ভাগ্যবান। তাদের খুঁজতে কত মানুষ হাজির হয়েছে! কত পাতা লেখা হয়ে গেল! ন্যায় বাবুরা বিচার করছে। খাদান মালিক ধরা পড়ল। তার নাকি সাজা হবে? কেন বাপ! তাহলে তারা খাবে কি? এই **পাহাড়** দেশেই ৫০,০০০ এমন কালো সুড়ঙ্গ চলে। সে কিন্তু জানে না 'র‍্যাট হোল মাইনিং'? কি কঠিন কথা গো? "ইঁদুর গর্তে ইঁদুর ঢোকে, বার হয়, মরে যায়! তার জন্য মানুষে কাঁদে? কত সৌভাগ্য। সে 'ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুন্যাল' জানে না! তারা খাদান বন্ধ করতে বলেছে সেই কবে। তবু খাদান চলে। এই পাহাড় দেশে ৬০,০০০০০ টন কয়লা ইঁদুরে তোলে! সে টন জানে না। জানে ঐ বেঁটে হাতগাড়িটা। তার পেটে কত কয়লা ধরে! ধরেই যায়, ধরেই যায়। যখন তার জিভ বার হয়ে আসে তখনও পুরো টাকা হয়না যে! ট্রাইবুন্যাল খেতে দেয়? ইঁদুরের আবার পরিবেশ কি গো? তার আবার সুরক্ষা! কি অলক্ষুণে কথা। খাদান বাবুদের কত তাকৎ! হাতগাড়ির মাল রাস্তার ধারে জমা হয়, ট্রাকে ওঠে চলে যায়, চলে যায় কেউ দেখতে পায়না। ইঁদুরে কাটা কালো কয়লা নাকি অনেক দামে বিক্রী হয়। ১ ট্রাক ১ লাখ। তাতে ইঁদুরের কি? সে ভারতীয় নেভি জানে? এন. ডি. আর. এফ জানে? আন্ডার ওয়াটার রিমোট অপারেটেড ভেহীকল জানে? জানে না। জানে না কেন তার মত ইঁদুর মরে গেলে সকলে মিলে মরা ইঁদুরের শরীর খুঁজতে স্বর্গ-মর্ত্য এক করে দিচ্ছে। এরা কি বোকা? কোটি কোটি গ্যালন জল তুলেও খাদানের জল একটুও কমে না। কি করে কমবে? খাদানের হাঁ তে ঢুকে গেছে নদীর জল! তবু তার ভাল লাগে। কিছু যদি পায়, মরা ইঁদুরের তবে নাকি মা-বাপ ভাই-বোন অনেক টাকা পাবে। অনেক টাকা! মরা ইঁদুরের এত দাম বাপ হে? তার ঘরের আর কাউকে এই কালো সুড়ঙ্গে আর ঢুকতে হবে না? ইঁদুরের চোখে জল আসে যে! সে যে এটা জানে তার মত কালো সুড়ঙ্গে ঢোকে আর বার হয় এমন কেবল পাহাড় দেশে নয় – সেই ঝরিয়া-আসানসোল-রাণীগঞ্জ-গাংটিকুলী-লালগঞ্জ-কালিদাসপুর – লক্ষ লক্ষ কালো সুড়ঙ্গে মরে কাঠ হয়ে, পচে ভূত হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে কত কত। তাদের জন্য কাঁদা নিষেধ, তারা থানা বাবুদের খাতায় নিখোঁজ। খাদান বাবুদের, থানাবাবুদের, পার্টিবাবুদের, সরকারবাবুদের, ন্যায়বাবুদের অনেক তাকৎ! ইঁদুরের গর্তের কালো হীরে অনেক টাকা দেয়। টাকা দেয় তাকৎ, টাকা থাকলে মানুষে নাটক দেখে। মরা ইঁদুরও খোঁজে! বড় মানুষদের বড় বড় শখ!■

সমাজ দর্পণ ঃ

মোবাইল ফোন মানুষের উপর কী প্রভাব ফেলেছে?

প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞানের লেখক আইজ্যাক অ্যাসিমভকে ১৯৮৩ সালে 'টরন্টো স্টার' পত্রিকা প্রশ্ন করেছিল যে ২০১৯-এর পৃথিবী কেমন হবে। অনেক কিছুই দূরদর্শিতার দ্বারা তিনি আগাম বলতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল আশ্চর্যজনক। তিনি বলেছিলেন যে একধরনের 'মোবাইল কম্পিউটারাইজড্ অবজেক্ট ঘরে ঘরে সিঁধ কেটে ঢুকবে ও ক্রমে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে।

'ইউনাইটেড নেশন এজেন্সী ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কম্যুনিকেশন টেকনোলজিস্' নামক সংস্থার ২০১৮-র শেষ পর্যায় দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে –

মোবাইল পরিষেবা ব্যবহারকারী (জনসংখ্যার শতাংশে)

	২০০৫ সালে	২০১৮ সালে
উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে	৫১.৩	৮০.৯
উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে	৭.৭	৪৫.৩

তারা বলেছে ২০১৮ সালের শেষে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের হাতে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে যাবে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা অ্যাসিমভের কথা সত্যি হয়েছে।

মোবাইল ফোন, তার কানেকশন, তাতে প্রাপ্ত ইন্টারনেট পরিষেবা একটি পণ্য, যার বাজার অতি দ্রুত প্রসারিত হয়ে চলেছে। সারা বিশ্বে মোবাইল ফোন উৎপাদনে সর্ব্বোচ্চ শিখরে রয়েছে চীন। ২০১৭ সালের পূর্বে দ্বিতীয় স্থানে ছিল ভিয়েতনাম। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ভারত, ভিয়েতনামের আগে অবস্থান করছে মোবাইল ফোন ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম উৎপাদনে। এদেশে গত তিন বছরে ১২০ টি নতুন কারখানা তৈরী হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ভারতে মোবাইল ফোন উৎপাদন বেড়েছে, কমেছে বিদেশ থেকে আমদানী। এগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে ভারত, চীন, ভিয়েতনামের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান মোবাইল ফোনের উৎপাদন অনেকাংশেই এখানকার বাজারকে লক্ষ্য করে। মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ছাড়াও, তার আনুসঙ্গিক সরঞ্জামগুলো এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের উৎপাদন ও ব্যবসা ক্রমবর্ধমান। ২০১৮-র নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ২,৯১,৬৮৯ কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার বসানো হয়েছে এই প্রয়োজনে। এর মাধ্যমে ১,১৯,৯৪৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এই নেটওয়ার্কিং-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মোবাইল নেটওয়ার্কিং-এর ব্যবসা করছে সারা দেশে গুটি কয়েক বড় বড় কোম্পানি, যাদের নাম বলাই বাহুল্য। এরা বিভিন্ন জেনারেশনের নেটওয়ার্কিং পরিষেবা দিয়ে থাকে। আমরা সাধারণত সেগুলোকে টুজি, থ্রিজি, ফোরজি – এভাবে চিনে থাকি। এক্ষেত্রে জি কথাটি জেনারেশন কথার সংক্ষিপ্ত রূপ। বলা হয়ে থাকে যে এই এক থেকে একাধিক জেনারেশন, মোবাইল পরিষেবার গতি অর্থাৎ স্পিডকে বোঝায়, যা বিশেষ করে মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করার সময় জরুরী হয়ে পড়ে। নতুন নতুন জেনারেশন নেটওয়ার্ক আসার সাথে সাথে বাজারে আসে তদনুযায়ী নতুন জেনারেশন সাপোর্টিং মোবাইল হ্যান্ডসেট। এই দুইয়ের সম্মিলিত খেলা মোবাইলের বিক্রির বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে। বড় বড় একচেটিয়া দেশী-বিদেশী কোম্পানি সারা দেশে এবং সারা পৃথিবীতে এই পণ্য-পরিষেবার বাজারকে একচেটিয়াকরণ করে দিয়েছে। কোনো পণ্যের ব্যবহারিক প্রয়োজন, যাকে বলা হয় ব্যবহার মূল্য, তা না থাকলে, তার বিনিময়ের প্রসঙ্গ কখনোই আসে না। এতো বিরাট বাজার এটাই তুলে ধরছে যে প্রযুক্তির এই সকল উদ্ভাবন, বিরাট সংখ্যক জনতার নানারকম প্রয়োজন মেটায়। পৃথিবীর প্রায় সবদেশের মতো আমাদের দেশের সরকার মানুষের জীবনে এই পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর পিছনে বিদ্যমান রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রয়োজন সহ বড় বড় কোম্পানিগুলির স্বার্থ সম্পর্কিত। এদেশে 'ডিজিটাল ভারত' নামে একটা সরকারী স্লোগান খুব শোনা যায়। এর প্রায়গিক দিকে এবার আসা যাক। সারা দেশের ১২২ কোটি জনগণকে আধার নম্বর দিয়ে এক সাংখিক পরিচিতির আধারে আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৩৪ রকম সরকারী পরিষেবা দেওয়ার আওতায় জনগণকে আনা হয়েছে বলে দেশের সরকার মনে করে। এর মধ্যে দিয়ে করদাতাদের জন্য ইফাইলিং ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে খাতা খোলা, ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন ও পুণর্নবীকরণ, যান

নিবন্ধীকরণ, জন্ম, বর্ণ, বিবাহ সব কিছুকেই আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের জন্য জনধন-আধার-চলমান-দূরভাষ (সংক্ষেপে জে. এ. এম) ব্যবস্থায় ৩২ কোটি ৯৪ লক্ষ জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ১২১ কোটি মোবাইল ফোন এবং ১২২ কোটি আধার নম্বরের সমন্বিত প্রক্রিয়ায় সরকারী সব রকম প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে দেশের অধিকাংশ জনগণকে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে যে আর্থিক লেনদেন তা বেসরকারী সংস্থাগুলোর মতো সরকারী সংস্থায় (যেমন ভারত ইন্টারফেস ফর মানি, সংক্ষেপে BHIM) বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান। ইউনাইটেড মোবাইল অ্যাপলিকেশন ফর নিউ এজ গভর্নান্স (সংক্ষেপে UMANG) – নামক মোবাইলে ব্যবহার্য অ্যাপ দ্বারা ৩০৭ টি সরকারী পরিষেবা পাওয়া যায়। এটি ২০১৭-র নভেম্বরে চালু হওয়ার পর ৮৪ লক্ষের বেশি ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি তাদের মোবাইলে ব্যবহার করছেন। জাতীয় বৃত্তি পোর্টালে নিবন্ধীকৃত এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক লক্ষ ৮ হাজার। যা মোট পরিমাণের সামান্য। দেশের ৩১৮টি হাসপাতালকে রোগীর চিকিৎসায় অতিদ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'ই-হসপিটাল' ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে মোবাইলের দ্বারা। কৃষকদের কৃষিজমির মাটি পরীক্ষার জন্য যে ১৩ কোটি কার্ড দেওয়া হয়েছে, তার ব্যবহার মূলত মোবাইল ফোনের ব্যবহারের দ্বারাই হয়। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। যার মধ্যকার অনেকগুলোই এখনো মানুষ অনেক কম ব্যবহার করেছেন। তবে সরকারী – বেসরকারী ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল ভারত' আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন জেনারেশনের নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে, মানব জীবনে মোবাইল পরিষেবা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারের বা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের কুপ্রভাব নিয়ে যাঁরা চিন্তিত তাঁরা এই প্রযুক্তির প্রসারকে দেখতে পারছেন না।

যে বিরাট সংখ্যক জনগণ সরকারী বিভিন্ন প্রকল্প-পরিকল্পনার দ্বারা বিভিন্ন সুযোগ পেতে ইচ্ছুক, যে বিরাট সংখ্যক জনগণ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে বা বেসরকারী বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজের সাথে এই প্রযুক্তিকে যুক্ত করেছেন বা আগামীতে করবেন, তারা কিন্তু এর 'কুপ্রভাব' নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন। বরঞ্চ এর উত্তোরোত্তর ব্যবহারের ফলে অনেকের এমন ধারণা হয়েছে যে মোবাইল ফোনের এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা রয়েছে! এক বা একাধিক বোতাম টিপে নিমেষে সময়সাপেক্ষ দুরূহ কাজ সহজেই হয়ে যায়। অনেকে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীর এই উদ্ভাবনকে যাদু মনে করেন। এখান থেকে এই ধারণার জন্ম হয় যে মোবাইলই এইসব কাজ করছে, মানুষের শ্রম সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন ধারণার কারণ মানুষের অজ্ঞতা। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মোবাইল ফোনের মতো কোনো কম্পুটারাইজড্ অবজেক্ট বা বস্তুর ব্যবহারিক শিক্ষাই কেবলমাত্র দেওয়া হয়। এই প্রযুক্তির পিছনে থাকা বিজ্ঞানটার একেবারে সাধারণ ধারণাটাও দেওয়া হয় না। তার ফলে বিজ্ঞানের এই উদ্ভাবনীর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ না জানা থাকায় এর ব্যবহার জনিত সামাজিক ব্যাধির জন্য অনেকে এই প্রযুক্তিকেই দায়ী করে বসেন।

যে সমস্ত মানুষ মোবাইল ফোন ও তাতে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিরোধিতা করে থাকেন তাঁদের নানা অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ অভিব্যক্তি নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। তারা অনেকে বলে থাকেন যে জন্মের অল্পকাল পরই বাবা-মা-রা মোবাইল ফোন – ইন্টারনেট ব্যবহার বাচ্চাদের সামনে এতো বেশি পরিমাণে করছেন যে বাচ্চারা এই নতুন খেলনার প্রতি তীব্র আগ্রহ দেখাচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা কান্নাকাটি করলে, খাওয়াতে গিয়ে ভুলিয়ে রাখতে বাবা-মার অস্ত্র এই যন্ত্রটি। কিছুকাল পর বাচ্চা একটু বড় হলে তার হাতে দিয়ে দিচ্ছেন এই যন্ত্রটি। ফলশ্রুতিতে তারা অসামাজিক হয়ে সারাক্ষণ এই যন্ত্রটি নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। খেলাধূলোয় আগ্রহ কমে যাচ্ছে, তাদের শারীরিক-মানসিক বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে না। বিপরীতে বাবা-মাও সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ব্যাস্ত থাকছেন, ছোটদের সাথে সময় দিচ্ছেন না, এমন অভিযোগও আছে।

সোসাল নেটওয়ার্কের দ্বারা আনসোসাল হয়ে ওঠার অভিযোগ শোনা যায়। 'নীলি তিমি' বা 'মোমো' নামক গেম খেলে অনেক কিশোর-কিশোরীকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত হতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্লু ফিল্ম, গুজব ছড়ানো, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসা, ধর্ম-জাতপাত-ভাষা-ইত্যাদিতে ভাগ করার প্রপাগান্ডা ছড়ানোর উদাহরণ অহরহ।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেমন, তেমন উন্নত দেশগুলোতেও একই ধরনের ধারণা পাওয়া যায়। বি. বি. সি-র দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা নলেজ এর ২০১৭-র ফেব্রুয়ারি সংখ্যা এই বিষয়টাকে কভার স্টোরি করেছে। তাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ 'হাউ টেকনোলজি ইজ রিওয়ারিং ইয়র ব্রেন' – প্রবন্ধ উন্নতদেশগুলির অবস্থা তুলে ধরছে। এদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারিতার বিভিন্ন দিকগুলোর উপর মোবাইল ফোন – ইন্টারনেটের ব্যবহারের ফল তুলে ধরা হয়েছে। যেগুলো একে একে তুলে ধরা হল।

(ক) একাগ্রতা বা অ্যাটেনশন

এখানে ২০১৫ সালে মাইক্রোসফ্ট কোম্পানির করা অনুসন্ধান অনুসারে এবং ইংলন্ডের এক অংশের শিক্ষকদের থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকার অনুসারে মোবাইলে ও অন্য উপায়ে ইন্টারনেট

ব্যবহারের ফল হিসাবে মানুষের একাগ্রতা হ্রাস পেয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলার যে আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও শিক্ষকদের এক অংশের অভিযোগ যে মোবাইল ফোন আসায় ও ইন্টারনেটের আনলিমিটেড ব্যবহার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে একাগ্রতা নষ্ট করে দিয়েছে। এ বিষয় তারা চিন্তিত, যদিও কোনো উপায় বার করা যাচ্ছে না।

(খ) মেজাজ বা মুড

এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানীরা মানুষের মনের হতাশা বা ডিপ্রেশনের সাথে অতিরিক্ত পরিমাণে ইন্টারনেট ব্যবহারের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তারা বিশেষ করে সোসাল মিডিয়ার ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত আলোকপাত করেছেন। এদের অনুসন্ধান অনুসারে এই প্রযুক্তি মানুষের মেজাজের উপর প্রভাব ফেললেও দেখতে হবে একে আমরা কীরূপে ব্যবহার করছি তার উপর নির্ভর করছে আমাদের মানসিক অবস্থা কী হবে।

(গ) স্মৃতি বা মেমরি

এদের অনুসন্ধান অনুসারে কম সময়ান্তরে মানুষের স্মৃতি কমছে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ান্তরে এই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফল এখনো অনির্ধারিত।

(ঘ) সামাজিক দক্ষতা বা সোসাল স্কিল ঃ –

এদের অনুসন্ধান অনুসারে বেশি-বেশি সংখ্যক মানুষের সাথে সম্যক যোগাযোগ কমছে। এটা পারিবারিক গন্ডি থেকে একটা মানুষের বৃহত্তর সামাজিক পরিচিতি পর্যন্ত। এর ফলে মানুষে মানুষে সামনা সামনি থাকলে যে বোঝাপড়া, মুখের অভিব্যক্তি বুঝতে পারা, তা সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

(ঙ) ঘুম ঃ – এদের অনুসন্ধান অনুসারে মানুষের ঘুমের সময়কাল (ঘুমোতে যাওয়া থেকে ঘুম ভাঙ্গা পর্যন্ত) পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

(চ) বই পড়া ঃ – মানুষের বই পড়ার ইচ্ছা কমছে এমন সিদ্ধান্ত করা এ মুহূর্তে অনুচিত হবে। তবে এই বিষয় আরো অনুসন্ধান জরুরি। এদের অনুসন্ধান অনুসারে মানুষের এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে অপেক্ষাকৃত খুঁটিয়ে পড়ার প্রবণতা কমে গেছে।

(ছ) একসাথে অনেকগুলো কাজ করা বা মাল্টি টাস্কিং

সাধারণভাবে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যামপাস অঞ্চলে তথ্য সংরক্ষণ এবং নতুন সৃষ্টিশীল স্মৃতি তৈরী হয়। দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন কালে একই সাথে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বা এর দ্বারাই অধ্যয়ন করছে, তাদের ক্ষেত্রে মস্কিষ্কের স্ট্রেইটাম (Striatum) অঞ্চল পদ্ধতি ও দক্ষতা সংরক্ষণ করে। হিপ্পোক্যামপাসে মানুষের পুরানো ধারণার সাথে নতুন জ্ঞানের তুলনা করার কাজ সম্পাদিত হয়। যা স্ট্রেইটামে হয় না। এরফলে মাল্টিটাস্কিং-এর ফলে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের স্মৃতিতে কম প্রোথিত (embedded) থাকে।

(জ) যান চলাচলকালীন যাত্রীর স্মৃতি ঃ –

গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা সংক্ষেপে জি. পি. এস প্রযুক্তি ব্যবহার করে আজকাল মানুষ যান চলাচল করছে। এর ফলে চলার পথের স্মৃতি মস্তিষ্কের যে জায়গায় সংরক্ষিত থাকে, তার কার্যকারিতা (হিপ্পোক্যামপাসের কার্যকারিতা) পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে এই প্রযুক্তি যারা নিয়মিত ব্যবহার করেন (যেমন ট্যাক্সি ড্রাইভার) তাদের ক্ষেত্রেই এমন ঘটছে।

উন্নত দেশগুলির মানুষের ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের নানা ফলাফল দেখে আমাদের মনে হয়, এগুলোর সাথে আমরাও পরিচিত। আমাদের জীবনে এর প্রভাব সমতুল্য। তাই উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষের উপর এই প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণার থেকে এবার আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

আমাদের মতো দেশের কিংবা উন্নত দেশগুলিতেও, ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের ইতিবাচক দিক কেউই অস্বীকার করেননি। এর ইতিবাচক দিককে এক কথায় বললে, সমগ্র বিশ্বের মানুষের জ্ঞানভান্ডার সামাজিক রূপ নিয়ে সকলের জন্য উপস্থিত। সেই জ্ঞান ভান্ডার গুগুলের মতো সার্চ ইঞ্জিনে এমন সুন্দরভাবে সাজানো, যে মানুষ খুব কম পরিশ্রম করে সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। বহুদেশের বহু মানুষের বৌদ্ধিক শ্রমের ফসল এমনভাবে সর্বজনীন হওয়ার কারণেই এটা সম্ভব হচ্ছে। অনেকে বলতে পারেন (যেমন বলছেন) যে এর ফলে পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানার্জন হচ্ছে না। ফলে সেই স্মৃতি তত গভীর দাগ কাটছে না মনে। এক্ষেত্রে একটা সাধারণ বিষয় আমরা বোধ হয় এড়িয়ে যাচ্ছি। মানব মস্তিষ্ক যা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ক্রমবিকশিত হয়ে চলেছে, তার কোনো অংশ আগের থেকে নির্দিষ্ট কোনো কাজে (যেমন বহু পরিশ্রমে বই ঘেঁটে জ্ঞানার্জন করা) কম ব্যবহৃত হলে তা বড় জোড় অব্যবহৃত থাকে। পাশাপাশি মানুষের দৈনিক কাজকর্মের ধরণ পাল্টানোর সাথে সাথে মস্তিষ্কের ভিন্ন অংশের ক্রিয়াশীলতাও বাড়ে। সাধারণ একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা সময় ছিল যখন লিখিত ভাষা মানুষের ছিল না। বর্ণমালার আবির্ভাব সাংকেতিক উপায়ে সর্বজন গ্রাহ্য লিখিত

ভাষার জন্ম দিল। প্লেটো নামক দার্শনিক বলেছিলেন যে এতে আমাদের মাথা খাটানোর কাজ কমে গেল। সত্যিই কী তাই? না। মানুষ তার অভিজ্ঞতা-জ্ঞান লিখে রেখে, অন্যকাজে তাকে ব্যবহার করল। গণিতের হিসাব এক সময় ক্যালকুলেটর উদ্ভাবনের আগে মানুষ লিখে বা মুখে মুখে স্মৃতি থেকে করতো, (এর চল এখনো আছে)। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতো হিসাব ক্যালকুলেটর আসায় তার উপর নির্ভরতা বিশ্বের জনগণের এক অংশকে এই দক্ষতা থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে তারা যদি এই সামান্য কাজটায় মাথাকে ব্যবহার না করে আরো জটিল সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত হয়, তবে অবশ্যই অব্যবহৃত মস্তিষ্ক নব জ্ঞানার্জনে ব্যবহৃত হবে। এই প্রক্রিয়ায় কম্পুটেশনের জন্য কম্প্যুটার। পরে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক অগ্রগতি। কিন্তু এটা চলতেই থাকবে, থামবে না। কারণ জ্ঞান সমুদ্র অনন্ত।

কিন্তু বিরূপ প্রভাবের বিষয় যাঁরা বলছেন, বিভিন্ন উদাহরণ দিচ্ছেন (যে উদাহরণগুলোও বাস্তবিক) সে বিষয় সাধারণ লক্ষণীয় বিষয় কী? সাধারণ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা বা ব্যবহার শেখার পর যদি আমরা জটিলতর গণিতের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বন্ধ করি, তার মত।

এমনটা কখনো হয় না। কারণ মানুষ তার জ্ঞানান্বেষণ বন্ধ করে না। কিন্তু ইন্টারনেট প্রযুক্তির যে বিশ্বজুড়ে প্রসার হয়েছে, তার ফলে যে বিশ্বনাগরিক মনের জন্ম হয়েছে, তাদের যদি বলা হয় তুমি এক দেশ থেকে অন্যদেশে গিয়ে কাজ করতে পারবে না, গবেষণার ক্ষেত্রে রাশ টানা হয়, বাধা দেওয়া হয় তবে তা সর্বোপরি যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিশ্বের সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে, তাকে অব্যবহৃত রেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে জোর করে আটকে রাখা হচ্ছে তাও অযৌক্তিক। একদিকে মানুষের চোখ মহাবিশ্বের সীমারেখা কোথায় তাতে নিবদ্ধ তো, অন্যদিকে তাকে রুজিরুটির জন্য দৈনন্দিন লড়াই করতে হচ্ছে। এই যে বৈপরীত্ব, তাই এমন নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। এই বিরোধের অবসান সামাজিক সম্পদের সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সম্ভব। তাই মানুষের উদ্ভাবনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কম্পুটার বা মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মানুষ যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে বিচরণ করে, তা তাকে বাস্তব জমির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় বলে অভিযোগ। তার থেকেই নানান সমস্যার উদ্রেক হয়। ফেসবুক, টুইটারের মাধ্যমে বহুমানুষের মধ্যে যে কথোপকথন চলে তার বেশিরভাগের বিষয়বস্তু অনেক পিছিয়ে থাকা বাস্তব জগতের নানা প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির গাঁথা। সেগুলো কখনো কখনো বিকৃতরূপ নিয়েও হাজির হয়।

উন্নত থেকে উন্নয়নশীল সারা পৃথিবীর জনগণ এক সাধারণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে বাস করেন। সেই সমাজের অর্থনীতিক কাঠামোতে থাকা মানুষের কেউ শ্রমিক, কেউ ক্ষুদ্র-মাঝারি কৃষক, ছোট উৎপাদক-ব্যবসায়ী, মধ্যবর্তী দালাল, সরকারী-বেসরকারী ক্ষেত্রের কর্মচারী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, পুলিশ, মিলিটারী, রাজনৈতিক নেতা – মন্ত্রী আর আমলা। এছাড়া আছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মী। এই রকম পেশায় থাকা মানুষ কম বেশি সব দেশেই বিদ্যমান। আর্থনীতিক সম্পর্কের বিচারে এদেরকে তিনটি বিভাগে ফেলা যায়। শুধুমাত্র শ্রম বিক্রি করে বেঁচে থাকা মানুষ, কোনো প্রকার শ্রম উৎপাদনে না দিয়ে মুনাফার পাহাড়ের মালিকরা, আর মাঝামাঝি অবস্থানকারীরা।

উৎপাদনের বিকাশ ও তার সাথে ও তার কারণে নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিকাশ হয়ে চলেছে। নতুন উদ্ভাবনী আবার উৎপাদনেরও বিকাশ ত্বরান্বিত করছে। এই কর্মকান্ডে সামগ্রিকভাবে বিরাট সংখ্যক মানুষ জড়িয়ে পড়ছে। যারা এই কর্মকান্ডে কোনো ভূমিকাই রাখছে না, তারাই শ্রমের এই ফসল রূপী মুনাফার মালিক। তাদের মুনাফার পাহাড় বেড়েই চলেছে। ফলে এতো কিছু সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, তার ব্যবহার মূল্য ভোগ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে উৎপাদক জনগণ। তাদেরকে কেবলমাত্র সেটাই দেওয়া হচ্ছে, যেটা রাষ্ট্রগুলির প্রশাসনিক কাঠামোকে আধুনীকরণের জন্য, দেশের অধিকাংশ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও পণ্য বিক্রি করে মুনাফার জন্য। এর একটি উদাহরণ মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের সর্বজনীন ব্যবহার। কিন্তু উৎপাদনের বিপুল বিকাশের কারণে সামাজিক প্রয়োজনে বিরাট বিরাট হিসাব, তথ্য, তথ্যের সংশ্লেষণ, তার ব্যবহারে (যেমন অটোমেশান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে) কম্পুটারের উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। আমাদের হাতের দশটা আঙুল থাকায় কোনো বস্তুর যেকোন পরিমাপ করতে, বা কোনো কাজের পরিমাণ নির্ণয়ে আমাদের জগতে ডেসিমেল পদ্ধতি এতোদিন ব্যবহৃত হয়েছে। শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত দশটি অঙ্ক (digit) বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে আমরা যোগ-বিয়োগ সহ সকল গাণিতিক সমস্যা ও তার সমাধান করেছি। কম্পুটার আসার আগে পর্যন্ত এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপায়। এর প্রয়োজন ছিল, কারণ আমাদের জগৎ হল বস্তু জগৎ। তাই তার সব রকম সমস্যা আর সমাধানে পরিমাপণ ছাড়া উপায় নেই। **কম্পুটারের মধ্যকার সমস্ত যন্ত্রাংশ 'চালু আর বন্ধ' এই দ্বিভাষা বোঝে। তাই তার ভাষা ডেসিমেল পদ্ধতিতে না হয়ে হয়েছে বাইনারি পদ্ধতি। একে সাংকেতিকভাবে বিজ্ঞানীরা শূন্য (0) এবং এক (1) দ্বারা প্রকাশ করেছেন।** তারা ডেসিমেল পদ্ধতি থেকে বাইনারি ভাষাকে কম্পুটারের ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। আমাদের জগতের ভাষাকে **'হাইলেবেল ল্যাঙ্গুয়েজ'** (উচ্চস্তরীয় ভাষা) বলে। আর কম্পুটারের ভাষাকে বলে **লো লেবেল ল্যাঙ্গুয়েজ**

বা **মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ** (নিম্ন স্তরীয় ভাষা)। যেকোনো কম্প্যুটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (অর্থাৎ যে ভাষায় কম্পুটারকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য) হল এই উচ্চস্তরীয় ভাষা। মানুষের ভাষার মতো তা অপেক্ষাকৃত জটিল, এখন দুই জন ব্যক্তি একটি জায়গায় কথোপকথন চালাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের একজন ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝেন না। অন্য জন তামিল ভাষা ছাড়া অন্যভাষা বোঝেন না। এদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে পারে একমাত্র মাঝখানে কোনো দোভাষী থাকলে। মানুষ এবং কম্প্যুটারের ভাষার মাঝখানে তাই এমন দোভাষীর প্রয়োজন। যেহেতু এই দোভাষী এই দুই ভাষার সমন্বয় ঘটান, তাই তার ভাষা হল **সমন্বিত ভাষা** বা **অ্যাসেম্বলী ল্যাঙ্গুয়েজ**। তাই একটি কম্পুটারে হাইলেভেল ল্যাঙ্গ্যুয়েজ দোভাষীর মাধ্যমে মেশিন ল্যাঙ্গ্যুয়েজে রূপান্তরিত হয়ে কম্পুটারের হার্ডওয়ারকে নির্দেশ দেয় কাজ করার জন্য। এইভাবে মূলত কম্পুটার কাজ করে। আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হিসাব, তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণের মতো দুরূহ কাজ (যার প্রয়োজনীয়তা উৎপাদনের তথা সমাজের বিকাশের কারণেই হয়েছে। যতদিন হয়নি, ততদিন পর্যন্ত কম্পুটারের উদ্ভাবনও হয়নি) এই প্রযুক্তির কারণে সম্ভবপর হয়েছে। আর তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে সেই তথ্য কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। সারা বিশ্বকে একই ব্যবস্থার অধীন করেছে। শুধু একটা দেশের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষ আজ আমাদের এই ধরিত্রীর সন্তান। তারা যতটুকু একত্রে কোনো কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে, ততটুকুই সাংঘাতিক ফল দিচ্ছে। সেকথা যেকোন আবিষ্কার থেকে উদ্ভাবন পর্যন্ত সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একদিকে বিরাট সংখ্যক মানুষের এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে তারা নানা ভাগে বিভক্ত। তাই অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এই **কম্পুটারাইজড্ মোবাইল অবজেক্ট** যা **মোবাইল ফোন** নামে পরিচিত, তা বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলির পরিকল্পনা অনুসারে প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত। জ্ঞানের বাধাহীন বিকাশ বিদ্যমান শ্রেণীরাষ্ট্রে সম্ভব নয়। কিন্তু এই সমাজই আগামী সমাজের শর্তের জন্ম দিচ্ছে। পাশাপাশি এই স্ববিরোধের কারণেই সৃষ্টি হওয়া নৈরাজ্য, মোবাইল ফোনের ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট নানান অভিযোগের কারণ। এমন অবস্থাই চলবে, যতদিন না মানুষ তার নিজের শ্রমের উৎপাদনকে নিজেদের প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। সবশেষে মোবাইল ফোন ব্যবহারের শারীরিক কুপ্রভাব নিয়ে যে বক্তব্যগুলো আছে তার চর্চা করা যাক। এর মধ্যে আছে দুটি দিক। এক – মোবাইল ফোনের 'রেডিয়েশন এফেক্ট' বা বিকিরণের প্রভাব। দুই – 'জীবাণু সংক্রমণ'।

প্রথমত এটা বলার যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে শক্তির প্রবাহকে গ্রহণ করে মোবাইল হ্যান্ডসেট। সেই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতিবেগুনী রশ্মি (৩৮০ ন্যানো মিটার) থেকে গামা রশ্মি (১০০ পিকো মিটারের কম) পর্যন্ত সীমার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে (যেমন অতিবেগুনী রশ্মি দিয়ে জলে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া মারা হয়) অথবা তা জীবকোষের মিউটেশন ঘটিয়ে দিতে পারে। এটা প্রমাণিত। কিন্তু এই সীমার বাইরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য জীবকোষে কী প্রভাব ফেলে তা এখনো নির্ণয় হয়নি। একটা মত আছে যে মানুষের মত প্রাণীদেহে প্রতিটি ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীর সঞ্চালন যে সংবেদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই আসলে তড়িৎ-রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল। আমাদের দেহে তাই তড়িৎ প্রবাহী তড়িৎচুম্বকীয় ফিল্ড বর্তমান। এই ফিল্ডের সংস্পর্শে অতিদীর্ঘ সময় ধরে অন্য তড়িৎচুম্বকীয় ফিল্ড (যা মোবাইল ফোনের কারণে হয়) থাকলে একে অপরের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এখনো পর্যন্ত এই প্রভাব (যদি সেই প্রভাব থাকে) কী তা অনির্ণীত। তবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সমস্ত কম-বেশি প্রভাব কখনোই একমুখী নয়। একে অপরের উপর প্রভাব ফেললে, অপরও একের উপর প্রভাবহীন থাকে না। কোন শক্তি তরঙ্গ দেহকোষে প্রভাব ফেলার চেষ্টার সময়ই দেহকোষও সেই প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এইকারণে রোগ সৃষ্টিকারী অ্যান্টিজেনের বিপরীতে অ্যান্টিবডিরও সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মোবাইল হ্যান্ডসেটের মত মোবাইল টাওয়ারকেও কাঠগড়ায় তোলা হয়ে থাকে। মোবাইল টাওয়ার মোবাইল ফোনের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে কোনো অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে রিলে পদ্ধতিতে ছড়িয়ে দেয়। এই টাওয়ার দ্বারা গ্রহণ করা বা অন্যত্র সরবরাহ করা তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও অনেক বেশী হয়। শুধু মোবাইল বা মোবাইল টাওয়ার নয় এমন অসংখ্য তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ আমাদের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, যাদেরকে বাদ দিলে মানব সভ্যতার অগ্রগতি অসম্ভব। যেমন ইলেকট্রিক পাওয়ার গ্রিড, সাবস্টেশন ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে ইকোলাই জীবাণু যা মানুষের দেহবর্জ্য পদার্থ থেকে পাওয়া যায়, তার সংক্রমণ মোবাইল ফোনের জন্য হচ্ছে। এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন নয়, তার ব্যবহারিক দিকটাই প্রধান। মানুষ প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের জন্য টয়লেটে থাকাকালীন এই মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছেন বলে এমন হচ্ছে বলে সংবাদপত্র বলছে।

মোবাইল ফোনে একাগ্রতা কমে যাওয়ার অর্থ অন্য বিষয় একাগ্রতা বৃদ্ধি। আর তার কারণ সামগ্রিক অর্থে কী তা আশাকরি আমরা বুঝতে পেরেছি। যাই হোক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের বিরোধিতা নয়, তাকে কীভাবে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় সেটাই দেখা দরকার।■

বিশেষ রচনা ঃ

কলকাতা শহর এবং শহরতলী অঞ্চল ভূমিকম্পে আদৌ নিরাপদ কী?

কলকাতা শহর এবং শহরতলী অঞ্চল নিয়ে কলকাতা মেট্রোপলিটান সিটি (চিত্র ১) বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চল সমগ্র পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতের ব্যবসা এবং শিল্প উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ১৯০১ সালে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ, ১৯৯১ সালে তা ৯ গুণের বেশি বেড়ে হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ। ২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনা অনুসারে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। বর্তমানে জনসংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে অনুমান। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ক্রমবর্দ্ধমান চাপে কলকাতা শহরের পূর্বদিকের বিশাল জলাভূমি [যা প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উপহ্রদ বা লেগুন (lagoon) অঞ্চলের একাংশ] এবং জলাজমি বুজিয়ে বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিশাল বিশাল বিল্ডিং, ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, স্টেডিয়াম, হাসপাতাল, অফিস, বাজার, স্কুল, ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। ইস্টার্ন বাইপাস এবং ভি আই পি রোডের ধার বরাবর রাজাহাট-নিউটাউন-সল্টলেক-কসবা-আনন্দপুর-পাটুলি হয়ে কামালগাজি-সোনারপুর অবধি অঞ্চলে এইসব কারণে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বহুতল বাড়ি যার মধ্যে অনেকগুলিই অপরিকল্পিতভাবে এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধক স্থাপত্যবিজ্ঞানকে বাস্তবত উপেক্ষা করে। কলকাতা মেট্রোপলিটানে অসংখ্য পুরনো জীর্ণ-বহুতল বাড়ি আছে যেগুলি এবং নতুন ঘনবসতিপূর্ণ বহুতলগুলির অধিকাংশই অপরিকল্পিত ভাবে এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছাড়াই নির্মিত।

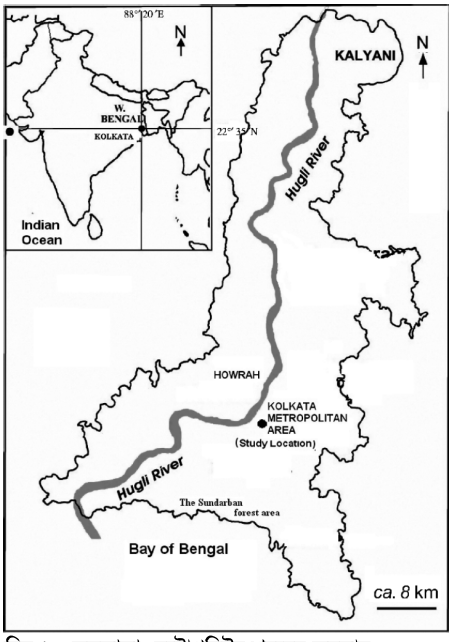

চিত্র ১ : কলকাতা মেট্রোপলিটন শহরের অবস্থান

এখন প্রশ্ন হল বড় কোন ভূমিকম্প হলে এই 'কংক্রিটের জঙ্গল' মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে তো? এই শহরে যেখানে প্রায় দেড় কোটি মানুষের বসবাস, কাজের জন্য যেখানে প্রতিদিন প্রায় আরও ৫-৭ গুণ মানুষের আনাগোনা – দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় কি আসন্ন? সাম্প্রতিক বিজ্ঞানীরা এই বিষয় বার বার সতর্ক করছেন, খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এই নিয়ে খবর হচ্ছে। তাই একটা চাপা আতঙ্ক রয়েছে শিক্ষিত মানুষের মনে। আসুন বিষয়টির বৈজ্ঞানিক সত্যতা বিচার করা যাক।

কলকাতা'র ভূতাত্ত্বিক অবস্থান

কলকাতা মেট্রোপলিটান শহর ভূতাত্ত্বিকভাবে বেঙ্গল বেসিনে অবস্থিত (চিত্র ২) বেঙ্গল বেসিনের পশ্চিমদিক ভারতে অবস্থিত আর পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল বাংলাদেশে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, বেসিন হল এমন একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যা প্রাকৃতিক (টেকটনিক) কারণে ক্রমশ মাটিতে বসে যাচ্ছে, নীচু অঞ্চল হওয়ায় উত্তরের হিমালয় এবং শিলং মালভূমি এবং পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি এবং পূর্বের আরাকান পবর্তমালা থেকে আগত নদীর পলি এই বেসিনে নিয়ত জমা হচ্ছে। এই বেসিনটিতে বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের সময় সামুদ্রিক পলিও সঞ্চিত হচ্ছে। এই বেসিনটিকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ভূতাত্ত্বিকভাবে – (১) নর্থ বেঙ্গল ফোরল্যান্ড – হিমালয়ের পাদদেশের সমভূমি অঞ্চল যা হিমালয় পবর্তমালার সমান্তরালে গঠিত। (২) বেসিন মার্জিন ফল্ট জোন – ছোটনাগপুরের মালভূমি এবং বেঙ্গল বেসিনের পশ্চিম সীমান্ত যেখানে নানা চ্যুতিতল রয়েছে। (৩) স্টেবল শেল্ফ জোন – বেসিনের পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু হয়ে ক্রমশ পূর্ব এবং দক্ষিণ

পূর্বে বিস্তৃত, এখানে বেসিনের নতি কম, (৪) কলকাতা – ময়মনসিং হিঞ্জ জোন – শেল্ফ জোন এবং ডিপ বেসিনের মধ্যবর্তী

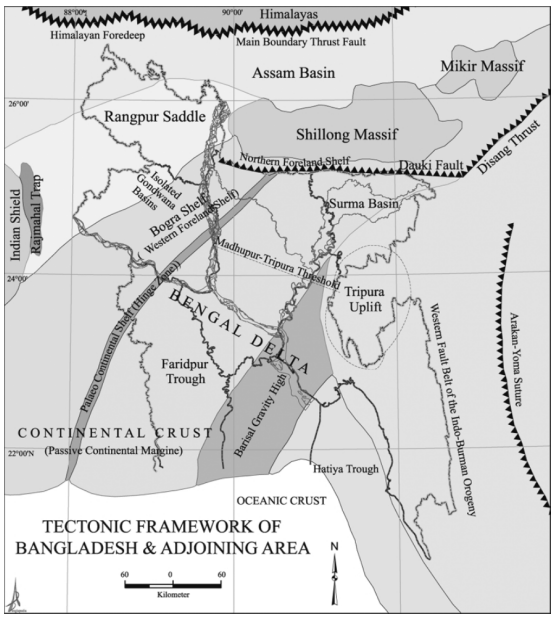

চিত্র ২ : বেঙ্গল বেসিনের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র

২৫ কি.মি চওড়া গ্র্যাভিটি হাই অঞ্চল। (৫) ডিপ বেসিন – পূর্বের গভীর বেসিন যেখানে বেসিনের গভীরতা কোথাও ১১ কিমি অবধি বিস্তৃত। বেসিনের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে পলির গভীরতা অনেক কম, যেমন খড়গপুর অঞ্চলে কয়েক সে.মি, বর্ধমান শহরে প্রায় ২-৩ কি.মি, রাণাঘাট অঞ্চলে ৪.৫-৫ কি.মি কলকাতা শহরে ৭.৫ কিমি এবং সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে ৯ কি.মি, বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে প্রায় ১১ কি.মি। এই বেসিনের উত্তরে এবং উত্তরপূর্ব ও পূর্বদিকে ইন্ডিয়ান প্লেট সীমান্ত অবস্থিত (হিমালয় পর্বতমালা যার ফলাফল), কলকাতা থেকে এই সীমান্তের দূরত্ব ৬০০-৮০০ কি.মি। এই প্লেট সীমান্তের কোথাও যেমন বিহার-নেপাল সীমান্ত, আসাম, মণিপুর, সিকিম, উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যত্র বড় ভূমিকম্প হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে ভূতাত্ত্বিকভাবে। এই বেসিনে তার ভূতাত্ত্বিক কারণেই রয়েছে অসংখ্য ফল্ট (চ্যুতি) যেগুলি বরাবর ভূমির ওঠা-নামা চলায় বেসিনে পলিসঞ্চয় হয়। এগুলি হল – গরনয়না-খন্ডঘোষ ফল্ট, জাঙ্গিপুর-গাইবান্ধা ফল্ট, মালদহ-কিষাণগঞ্জ ফল্ট, সাঁইথিয়া-বহমানি ফল্ট, পিংলা ফল্ট এবং ছোটনাগপুর সীমান্তে (পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-আসানসোল) অসংখ্য গ্রাভিটি ফল্ট। দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তরপূর্ব মুখী কলকাতা-ময়মনসিংহ হিঞ্জ জোন যা বিজ্ঞানের ভাষায় গ্র্যাভিটি হাই, কলকাতা শহরের থেকে মাত্র ৪.৫ কি.মি নীচে অবস্থিত।

কলকাতা মেট্রোপলিটান ভূমিকম্পে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?

ভারতীয় ভূবিজ্ঞান দপ্তরের সিসমিক জোন ম্যাপে কলকাতা মেট্রোপলিটান শহরকে ভূমিকম্পের সম্ভব্যতা অনুসারে জোন III তে ফেলা হয়েছে। মুম্বই এবং চেন্নাই শহরকে জোন II তে। দিল্লী শহরকে ফেলা হয়েছে জোন IV অঞ্চলে (জোন V সবচেয়ে বিপজ্জনক, জোন I বিপদহীন)। গুয়াহাটি, শ্রীনগর, আগরতলা, আইজল প্রভৃতি রয়েছে জোন V অঞ্চলে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার পড়েছে জোন IV অঞ্চলে।

মিনিস্ট্রি অব আর্থ সায়েন্সের উদ্যোগে দেশের ৪২টি শহর কোনটা কতটা বিপজ্জনক তা পুর্ণমূল্যায়ন করার জন্য অতি সম্প্রতি বিস্তৃত গবেষণা করেছে। কারণ শহরগুলিতেই ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি এখানে বড় বড় স্থাপত্য থাকায় এবং শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায়। পাহাড়ি অঞ্চলের গ্রামেরও ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি প্রবলভাবে হয় পাহাড় ভেঙ্গে পড়া, নদীর গতিপথ বদলে যাওয়া ইত্যাদির কারণে। সমুদ্র উপকূলে ভূমিকম্প জনিত সুনামিতেও বড় বিপর্যয় হয়।

যাই হোক, শহরগুলির সিসমিক মাইক্রো জোন (ভূমিকম্প প্রবণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল) নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সম্প্রতি এক বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে কলকাতা মেট্রোপলিটান শহরে। খড়গপুর আই আই টি-এর ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক শঙ্কর কুমার নাথের নেতৃত্বে একটি টীম ৪ বছর ধরে এই অঞ্চলে একটি বিস্তৃত গবেষণা চালিয়েছেন জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৫ অবধি সময়কালে। ৪৩৫ বর্গ কি.মি অঞ্চলের ৩৫০ টি জায়গার মাটিতে খনন করে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, প্রায় সর্বত্র জলস্তর মাপা হয়েছে। মাইক্রো সিসমিক জোনেশন প্রক্রিয়ায় গবেষণালব্ধ ফল থেকে অধ্যাপক শঙ্কর নাথ এবং তাঁর টীম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে **কলকাতা মেট্রোপলিটান শহরের অধিকাংশ অঞ্চল জোন III নয়, জোন IV এর অন্তর্গত। কেষ্টপুর, সল্টলেক, নিক্কোপার্ক অঞ্চল রয়েছে জোন V এর অন্তর্গত এবং ভয়ঙ্করভাবে বিপজ্জনক স্থিতিতে। সরশুনা এবং জোকা অঞ্চলে হল শহরের সবচেয়ে কম বিপজ্জনক অঞ্চল।** হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ের হাওড়া শহর এবং হুগলী জেলার শহরতলী অঞ্চলও কম বিপজ্জনক জলস্তরের অবস্থান এবং মাটির বৈশিষ্ট্যর কারণে।

অধ্যাপক শঙ্কর নাথ হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকা (১৬/৭/২০১৫)কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন "সল্টলেক, রাজারহাট, নিউটাউন এবং ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাশের

দক্ষিণ ও পূর্বধারের ঘনবসিতপূর্ণ অঞ্চলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত চলছে। এছাড়াও কসবা, পার্কস্ট্রীট, বিবিডি বাগ অঞ্চলেও একই অবস্থা। এই সমস্ত অঞ্চলের ঘর বাড়ি, স্থাপত্য আসলে ভেসে আছে একটা পাতলা থকথকে আস্তরণে (floating on a bed slurry) এবং বড় ভূমিকম্প কলকাতাকে কাঁপুনি ধরালে তা মাটিতে ভেঙে পড়বে।"

ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন এইসব অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭.৫ মিটার অবধি মাটির স্তরে রয়েছে বালি, কাদা এবং পচা ঘাসপাতা ইত্যাদি। এই মাটির স্তরের মধ্যেই রয়েছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। কলকাতা মেট্রোপলিটান শহরের পশ্চিমে রয়েছে হুগলী নদী এবং পূর্বে রয়েছে জলাভূমি। এগুলিই ভূগর্ভস্থ জলের প্রধান উৎস যা এই মাটির স্তরকে (অন্তত ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ মিটার অবধি) প্রচন্ড অস্থিতিশীল করে রেখেছে স্থাপত্য বিজ্ঞানের চোখে।

অধ্যাপক নাথ হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকাকে দেওয়া এক বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে বলেছেন "রিখটার স্কেলে ৬.৫ মাত্রার বেশি মাপের বড় ভূমিকম্প ঘটলে **লিক্যুইফ্যাকশন** নামক প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবে যার ফলে এই নরম মাটি জলের সাথে মিশে সাময়িকভাবে তার সমস্ত স্থিতিশীল থাকার ক্ষমতা (strength) হারিয়ে একপ্রকার আঠালো তরলের মত আচরণ করবে। এর ফলে সবকিছু তার উপর ভেঙে পড়বে। এই ঘটনা ঘটবে ভূকম্পনের সময়কার দোলনের জন্য।"

সমুদ্রের পাড়ে ভেজা বালির উপর দাঁড়ালে ঢেউ এলে আমাদের পায়ের পাতায় যে অনুভূতি হয় এবং পা আস্তে আস্তে বালিতে ঢুকে যেতে থাকে লিক্যুইফ্যাকশন প্রক্রিয়াকে এভাবে বোঝা যেতে পারে।

এই লিক্যুইফ্যাকশন প্রক্রিয়া কলকাতায় আগেও ঘটেছে। ১৯৩৪ সালে বিহার-নেপাল সীমান্তে রিখটার স্কেলে ৮.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পে মেটিয়াবুরুজ, বালিগঞ্জ, রবীন্দ্র সদন, শোভাবাজার অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যা জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে জানা যায়।

অধ্যাপক শঙ্কর নাথ বলেন **"যদি ভূমিকম্পের জন্য লিক্যুইফ্যাকশনের ঘটনা ঘটে তবে কলকাতার ভূপৃষ্ঠের নিচের অন্তত ৩টি মাটির স্তরে তা ঘটবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রভাব পড়বে ৪-১০ মিটার নিচের মাটির স্তরে। এটাই কলকাতার স্থাপত্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি ঘটাবে।"**

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাম্প্রতিক অতীতে যে বড় বড় ভূমিকম্পে কলকাতা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলি হল –

১৮৯৭ – আসাম ভূমিকম্প, মার্সেলির মাত্রা অনুসারে VIII মাত্রা; ১৯১৮ – শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প; ১৯৩০ – ধুবড়ি ভূমিকম্প; ১৯৬৪ – ক্যালকাটা ভূমিকম্প, মার্সেলির মাত্রা অনুসারে VII মাত্রা।

(ধ্বংসলীলার মাত্রা অনুসারে বিজ্ঞানী মার্সেলি ভূমিকম্পকে I থেকে XII ভাগে ভাগ করেছেন। শ্রেণী XII সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।)

সমগ্র আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে প্লেট সীমান্তে অবস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা মেট্রোপলিটান শহর কিন্তু ভূগর্ভস্থ মাটির বিশেষ চরিত্রের কারণে জলস্তরের অবস্থানের কারণে, বেঙ্গল বেসিনে নানা চ্যুতিতল থাকার কারণে ভূমিকম্পে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে। পূর্ব কলকাতা বিশেষত ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাশ সংলগ্ন অঞ্চলে সল্টলেক, রাজারহাট, নিউটাউন গড়ে উঠেছে লবণ হ্রদকে গঙ্গা থেকে আনা নরম পলি দিয়ে বুজিয়ে। দমদম এয়ারপোর্ট, বাঙ্গুর, লেকটাউন, বাগুইহাটি, কসবা, তিলজলা, পাটুলি প্রভৃতি অঞ্চল তৈরি হয়েছে জলাভূমি বুজিয়ে। সমগ্র শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জলাভূমি বুজিয়ে বিশাল বিশাল স্থাপত্য গড়ে উঠছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের তোয়াক্কা না করে এগুলি গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। কলকাতা পৌরসভা বা সংলগ্ন পৌরসভাগুলি বহুক্ষেত্রেই জেনেশুনে এগুলির অনুমোদন দিয়ে এসেছে। সর্বত্রই চলছে বেনিয়মী কন্সট্রাকশন। স্থাপত্য গড়ার সময় খাতায়-কলমে এক রিপোর্ট দেখানো হচ্ছে আর বাস্তবে ঘটছে অন্য কিছু। এই শহরে রয়েছে অসংখ্য জীর্ণ এবং পরিত্যক্ত বাড়ি যা অবিলম্বে ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। কয়েক লক্ষ স্থাপত্যের পুর্ণনির্মাণ প্রয়োজন।

কিন্তু এই কাজগুলি করবে কে? এর দায়িত্ব পৌরসভাগুলির। কলকাতা মেট্রোপলিটান শহরের অন্তর্গত সকল পৌরসভাগুলিকে অবিলম্বে এই কাজগুলি করাতে বাধ্য করতে পারে বিজ্ঞান সচেতন, সমাজ সচেতন জনগণ। আসন্ন ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে কলকাতা মেট্রোপলিটান শহরকে রক্ষা করতে তাই সমগ্র অঞ্চলের জনতার পথে নামা জরুরি।■

তথ্যসূত্র : 1) Earthquare scenario in W.B with emphasis on seismic hazard microzonation of the city of Kolkata, India – S. K. Nath, M. D. Adhikari, S. K. Maity, N. Devaraj, N. Srivastav & L. V. Mahapatra (August 2014), Natural Hazard & Earth System Science. 2) Large areas of kolkata could sinr if Earthquakes strikes (Hindusthan Times; 16.7.2015). 3) Seismic Vulnerabtility & Risk Assessment of Kolkata - www. wbdmd.gov.in. 4) Effect of soil on Ground Motion Amplification of Kolkata City - www.rasearchgate.net/publication.

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরি রাম আহমেদ

দ্বিতীয় পর্ব

কোপার্নিকাসের হাত ধরে মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব এসেছিল। কোপার্নিকাসের মহাবিশ্বের ধারণা আকাশ থেকে পরে নি। তাঁর আগের বহু চিন্তাশীল মানুষের বিভিন্ন চিন্তার ফলশ্রুতি এটি।

মানুষ কিভাবে চিন্তা করে? আজকের বিজ্ঞান অনুসারে মানব মস্তিষ্ক আর সুসুম্নাকান্ড (মাথার নীচে শিরদাঁড়ার পিছনে অবস্থিত) অসংখ্য নার্ভকোষ দ্বারা সারা দেহের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। পারিপার্শ্বিক জগতের যাবতীয় ক্রিয়ার ফলে এই নার্ভকোষের দ্বারা তথ্য কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে যায়। যেখানে তা বিচার-বিশ্লেষণের পর নির্দেশ যায় সারা দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গে। একেই এক কথায় বলে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এটাই বলে থাকে। তাই চিন্তা হল বস্তুজগতের ক্রিয়ার ফল বা তার প্রতিফলন। মানব মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এই অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনই অন্তর্দৃষ্টি। এ না হলে ক্যামেরায় তোলা ছবি আর আমাদের দেখার মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকতো না।

মানুষের চিন্তা তাই বাইরের জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই বাইরের জগৎকে মানুষ কোন্ অবস্থান থেকে দেখছে? তার উপর নির্ভর করে সেই বস্তুর সম্পর্কে কি ধারণা সে পোষণ করছে। গতিশীল মানব সমাজের ইতিহাস দেখলে পাই দাসমালিকের দৃষ্টি থেকে দাসেদের মৃত্যুদন্ড না দিয়ে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখাটাই ন্যায়। এতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হয়ে চলে। বিপরীতে দাসেদের দৃষ্টি থেকে দেখলে – সবকিছু উৎপাদনকারী বিরাট জনসংখ্যাকেই দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখাটা অন্যায়। তাই দাসযুগে হয়েছে দাসবিদ্রোহ। গতিশীল বস্তুজগৎকে পর্যবেক্ষণ করেও মানব মনে এমন আপেক্ষিক বা সাপেক্ষিক ধারণা অবস্থান ভেদে হয়েছিল। এ সম্পর্কিত বিষয় প্রথম তুলে ধরেন গ্যালিলিও। তিনি একটা উদাহরণ দিয়ে বলেন –

পৃথিবীর সাপেক্ষে গতিশীল একটা জাহাজে এবং ভূপৃষ্ঠে বলবিদ্যার সূত্রগুলির ফলাফল হবে একই। তবে তার জন্য জাহাজের গতি বাড়ানো-কমানো করলে চলবে না। আবার দিক পরিবর্তন করলেও চলবে না।

এই পুরো বিষয়টাকে গ্যালিলিওর রেফারেন্স ফ্রেমের ধারণা থেকে ব্যাখ্যা করা দরকার। 'রেফারেন্স ফ্রেম' বা 'সাপেক্ষ কাঠামো' কী? ফ্রেম বললেই যে চিত্ররূপ আমরা কল্পনা করি, তা হল একটা কাঠামো দিয়ে চারিদিকে ঘেরা কোনো ছবি। ছবিটা সাধারণত দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে। যদি ছবিটা ত্রিমাত্রিক হয়, তার সাপেক্ষ কাঠামোও ত্রিমাত্রিক হতে হবে। যাই হোক কোন দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক স্থলকে একটা সীমারেখার মধ্যে বিচার করলে, সেটা তার ফ্রেম। যেখানে উপস্থিত বস্তুগুলোর স্থিতি অথবা গতিশীল অবস্থানকে ঐ এলাকার সাপেক্ষে বিচার করতে হবে।

এবার গ্যালিলিওর উদাহরণটায় আসা যাক।

যদি প্রথম ফ্রেমটা হয় এই পৃথিবী। তবে তার সাপেক্ষে আমরা একটা সমবেগে গতিশীল জাহাজ দেখবো। জাহাজের পাশাপাশি অন্য কোনো বস্তুকে পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির দেখছি। আবার কোনো বস্তুকে দেখছি সমবেগে গতিশীল।

যদি দ্বিতীয় ফ্রেমটা হয় সমবেগে গতিশীল জাহাজ আর পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির ও সমবেগে গতিশীল ঐ বস্তুদ্বয় যদি জাহাজের উপরই থাকে। তবে জাহাজে অবস্থানকারী তাদের একই ভাবে স্থির ও সমবেগে গতিশীল দেখবে।

– এই উদাহরণটাই গ্যালিলিও দিয়েছিলেন। মনে রাখার বিষয় গ্যালিলিও বলেছিলেন গতি বাড়ানো-কমানো যাবে না, দিক পরিবর্তন করাও যাবে না। এখান থেকেই দুইপ্রকার সাপেক্ষ কাঠামো বা রেফারেন্স ফ্রেমের ধারণার জন্ম হয়। একটি হল জড় সাপেক্ষ কাঠামো বা ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম। অন্যটি অজড় সাপেক্ষ কাঠামো বা নন ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম। আমরা পরবর্তীকালে নিউটনের তিনটি গতিসূত্র নিয়ে আলোচনা করবো। সেখানে প্রথম সূত্রে বস্তুর জড়তার ধারণা পাবো, যার উৎস গ্যালিলিও-র এই জাহাজের উদাহারণ। দ্বিতীয় সূত্রে পাবো অজড় সাপেক্ষ কাঠামো বা নন ইনারশিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সে (অর্থাৎ যখন বস্তুর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে) কী ঘটে। তৃতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্রের অগ্রগতি। কোপার্নিকাস থেকে গ্যালিলিও, নিউটনের সময়কালে বিজ্ঞানের অর্থাৎ বস্তু

গ্যালিলিও

জগৎকে দেখার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছিল। এসব হয়েছিল মানব সমাজে আর্থসামাজিক পরিস্থিতির অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলে।

গ্যালিলিওর জন্মকাল ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। অর্থাৎ ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির শেষ পর্যায়ে। সামন্ততন্ত্রের গর্ভেই জন্ম নেওয়া ও ক্রমবিকাশমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সময়কাল এটা। আমরা আগের পর্বে বলেছিলাম, কোন্ সামাজিক প্রয়োজন থেকে মানুষ পাশবিক জীবন ত্যাগ করে দাস সমাজ গড়ে তুলেছিল। আমরা এটাও দেখিয়েছি, এই দাস সমাজও কোন্ সামাজিক প্রয়োজনে তারই গর্ভে জন্ম দিয়েছিল সামন্ত সমাজের।

বিভিন্ন দেশের কাঠামোগত বিভিন্নতা থাকলেও সব দেশেই সামন্ত সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির মূল সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল কৃষকদের জমির সাথে বেঁধে রাখা। ইউরোপে এর কাঠামোগত বিন্যাস ছিল – সর্ব্বোচ্চ স্তরে রাজা, তার রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রকে অনুগত বণিক-অভিজাত ও সেনাপতিদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জমির কৃষক সহ তুলে দিত দেখভাল করার জন্য। নিজের দখলে রাখতো এক অংশ খাস জমি। রাজার দেওয়া জমি যারা পেত, তারা রাজনির্দেশে যুদ্ধের জন্য সেনা সরবরাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। এই সেনারা সংশ্লিষ্ট জমির কৃষকদের থেকেই আসতো। একই শর্তে সংশ্লিষ্ট জমির প্রভুরা আবার জমির পূণর্বন্টন করতো। অর্থাৎ জমি (যা উৎপাদিকা শক্তির অন্যতম অংশ) তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

পাশাপাশি নগরগুলোতে কুটির শিল্প বিকশিত হয়ে ওঠে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। নগরগুলো ও বাণিজ্য দাসযুগেই ছিল। দাসযুগেই উৎপাদনের বিকাশের ফলে কৃষি উৎপাদন থেকে কুটির শিল্প আলাদা হয়ে গেছিল। এটা ছিল মানুষের সমাজে পারিবারিক শ্রম বিভাজনের পর দ্বিতীয় শ্রম বিভাজন। দাসযুগের বিকশিত পর্যায় নগরগুলো গ্রামীণ ব্যবস্থার সাথে খাপ খেত না।

যেকোনো সমাজে বাস করা মানুষজনের চিন্তার প্রক্রিয়া, তাদের আচার-আচরণ নির্ভর করে সেই সমাজের সাথে তার কী সম্পর্ক, তার উপর। সমাজের প্রয়োজনেই মানুষ যে উৎপাদন করতে শিখেছিল, কালক্রমে সেই উৎপাদন মানব সমাজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল। শুধু তাই নয় উৎপাদন বিনা মানুষের বেশীদিন বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে গেছিল। তাই মানুষের মনের সকল প্রতিক্রিয়া, তার চারপাশের জগতের অবিরত পরিবর্তনশীলতা-গতির কারণে। এই কারণে মানব মনের ক্রম পরিবর্তনকে বুঝতে হলে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজের, বিশেষ করে তার উৎপাদন পদ্ধতিকে বোঝা দরকার।

সামন্ত সমাজের প্রথম অবস্থায় গ্রামগুলোতে কৃষি উৎপাদন ছিল রাজা তথা প্রভুদের ভোগের জন্য, আর গরিব কৃষকদের খেয়ে-পড়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকার উৎপাদন ব্যবস্থা। অন্য দিকে নগরগুলোতে ছিল কুটির শিল্প আর বাণিজ্য কেন্দ্র। যেখানে তাদের মালিক এক উদিয়মান মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছিল। যারা শুধুমাত্র ভোগ বা বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন করাতো না। স্বাভাবিকভাবেই এই উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির একটা বিরোধ ছিল। ইউরোপে এই সময়কালটা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আশপাশ ছিল। এই সময়কাল সম্পর্কে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ তাঁর 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রবন্ধে ভূমিকায় লেখেন –

"ইউরোপ যখন মধ্য যুগ থেকে উত্থিত হয় তখন শহরের উদীয়মান মধ্যশ্রেণী ছিল তার বিপ্লবী অংশ। মধ্যযুগীয় সামন্ত সংগঠনের মধ্যে তারা একটা সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাও তার বর্ধমান ক্ষমতার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; মধ্যশ্রেণীর, bourgeoisie- বিকাশের সঙ্গে সামন্ত ব্যবস্থার সংরক্ষণ খাপ খাচ্ছিল না; সুতরাং সামন্ত ব্যবস্থার পতন হতে হল।"

সুতরাং ইউরোপে সামন্ত সমাজের অবসানের কালে তার উৎপাদন পদ্ধতি নড়বড়ে হয়ে গেছিল। পাশাপাশি নতুন উৎপাদন পদ্ধতির জন্ম ও বিকাশ পূর্বের সাথে আর সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকলো না। এই অবস্থায় নতুন যুগের সূচনা কালে কোপার্নিকাস-ব্রুনোর আবির্ভাব ঘটে। এই কাল পর্যায় সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধেই এঙ্গেলস্ লিখেছেন –

"তাছাড়া মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয়ের সমান্তরালে শুরু হয় বিজ্ঞানের বিপুল পুনরুজ্জীবন; জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তের চর্চা ফের শুরু হয়। শিল্পোৎপাদনের বিকাশের জন্য বুর্জোয়ার দরকার ছিল একটা বিজ্ঞানের যাতে প্রাকৃতিক বস্তুর দৈহিক গুণাগুণ এবং প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের ক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপিত করা যায়। এতদিন পর্যন্ত

বিজ্ঞান হয়ে ছিল গির্জার বিনীত সেবাদাসী, খ্রীষ্ট বিশ্বাসের আরোপিত সীমা তাকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হত না। সেই কারণে তা আদৌ বিজ্ঞানই ছিল না। বিজ্ঞান বিদ্রোহ করল গির্জার বিরুদ্ধে; বিজ্ঞান ছাড়া বুর্জোয়ার চলছিল না, তাই সে বিদ্রোহে যোগ দিতে হল তাকে।"

আমরা কোপার্নিকাস থেকে ব্রুনো পর্যন্ত গির্জার দ্বারা এই মুক্তচিন্তাশীল বিজ্ঞানীদের নিপীড়নের কাহিনী আগেই বিবৃত করেছি। এরকম এক বিপ্লবী সংকটকালেই বিজ্ঞান নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছিল। এই প্রেক্ষাপটে – গ্যালিলিও-র আগমন।

তাঁর বয়স যখন ১৭ বছর, তিনি তখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি নিয়ে পড়বেন। কিন্তু ইউক্লিডের জ্যামিতি শিক্ষা তাঁকে গণিতের প্রতি আকর্ষিত করল। আমরা ইউক্লিড নামক গণিতবিদের সম্পর্কে আগের পর্বে উল্লেখ করেছি। ইনি হলেন এই জ্যামিতির স্রষ্টা। আমরা স্কুলপাঠ্যস্তরে যে জ্যামিতি শিখে থাকি, তাই হল ইউক্লিডিও জ্যামিতি। ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র, ত্রিভূজের ধর্ম, বৃত্তের পরিমাপের যাবতীয় জ্যামিতিক সূত্র, এককথায় সকল নিয়ত আকারের বস্তুর আকার সংক্রান্ত জ্যামিতি নিয়ে যা স্কুলপাঠ্যস্তরে শিক্ষালাভ করে থাকি, সবই এই ইউক্লিডিও জ্যামিতি।

এই জ্যামিতি ছাড়াও বর্তমানে আরেক ধরনের জ্যামিতি সম্পর্কে আমরা শিখেছি। তার সম্পর্কে যথা সময় আসবো। এই ইউক্লিডের জ্যামিতিতে বিন্দু এমন কিছু যার শুধু অবস্থান আছে, অথচ তার কোনো মাপ নেই। ফলে যার কোনো মাপই নেই, সেখানে কিছু না থাকার সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ তা, থেকেও নেই। এমনই অসংখ্য বিন্দুকে নিয়ে রেখা, সেই রেখাগুলো জুড়ে ক্ষেত্র। একাধিক ক্ষেত্র পরস্পর আবদ্ধ হয়ে তিনমাত্রা সম্পন্ন বস্তু। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে একটা বিন্দু থেকে অন্য একটা বিন্দুর সবথেকে নিকটতম দুরত্ব মাপা যায় একটা সরলরেখা দিয়ে তাদের জুড়লে। এই সরলরেখাটা অবস্থান করে একটা সমতলের উপর। এবারে যদি সেই সমতলটাই কোনো কারণে ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু হয় তবে সেই বক্রতলে আঁকা পূর্বে থাকা সরলরেখাটি একটি বক্ররেখায় রূপান্তরিত হবে। তখন সেই তলের সাপেক্ষে কিন্তু আগের দুটি সীমান্তের বিন্দুকে জোড়া লাগানো বক্ররেখা (যা আগে সরল রেখা ছিল) বিন্দুদ্বয়ের নিকটতম দূরত্বকেই বোঝায়। কারণ আগেকার সরলরেখা যা এখন বক্ররেখায় রূপান্তরিত হয়েছে, তার মধ্যে বিন্দুর পরিমাণ একই রয়েছে।

ইউক্লিডিও জ্যামিতি এভাবে দেখে না। সেখানে ঐ অবস্থায় বক্ররেখাটির প্রতিটি বিন্দুকে যে কাল্পনিক সমতলে রাখা যায়, সেই সমতলই কল্পনা করা হয়। বাস্তব জগতের থেকে এই জ্যামিতি তাই কাল্পনিক হয়ে যায়। বাস্তব জগতে উঁচু-নীচু পাহাড়-পর্বত ঘেরা স্থানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার নিকটতম রাস্তা সরলরেখা হয় না। এই অ-ইউক্লিডিও জ্যামিতির ব্যবহার মানব মনে নিউটনের সময়কাল পর্যন্ত আসে নি। কারণ তার পরিস্থিতি তৈরী হয়নি তখনও পর্যন্ত। নিউটনের পরবর্তীতে পদার্থ বিজ্ঞানের কোন্ প্রয়োজনীয়তা এই নতুন জ্যামিতির আবিষ্কার করল তা কালক্রমে আসবো।

ইউক্লিড

গণিতের প্রতি আগ্রহ গ্যালিলিওকে বাস্তব দুনিয়াকে দেখার ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন দৃষ্টি দিল। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও সরল দোল গতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন আগ্রহভরে। এর জ্যামিতিক গতীয় অবস্থা নজর কাড়লো। এর আগে পর্যন্ত সূর্যদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা মাঠে কোনো দন্ডের পরা ছায়া দেখে মানুষ সময়ের হিসাব করতো। গ্যালিলিও পেন্ডুলাম আবিষ্কার করলেন। তারই সূত্র ধরে আবিষ্কার হল আধুনিক ঘড়ি। সময় মাপার ক্ষেত্রে আমরা একটা যন্ত্র পেলাম, যা মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় অবিরত গতিশীল।

জ্যামিতিতে কোনো বস্তুর অবস্থান জানতে গেলে, আগে থেকে নির্দিষ্ট করা কতগুলি জিনিসের সাপেক্ষে, তার অবস্থান বুঝে নিতে হয়। এই পদ্ধতি আমরা বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা থেকেই পেয়েছি। ধরা যাক আমাদের স্কুলের খেলার মাঠটা কোথায়, তা নির্ণয়ের প্রয়োজন। ইস্কুলের গেট থেকে উত্তরে একশো পা গেলে আর গ্রামের হাট যেখানে বসে সেখান থেকে পাঁচশো পা পশ্চিমে গেলে খেলার মাঠ পাবো। জ্যামিতিতে একই রকমভাবে দুটি অক্ষ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। এরা পরস্পর সমকোণে রয়েছে। যদি তাদের একটি উত্তর দক্ষিণে

বিস্তৃত থাকে, তো অন্যটি পূর্ব-পশ্চিমে। আর এরা পরস্পর পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটিকে বলে মূলবিন্দু, ইংরাজিতে অরিজিন (অর্থাৎ যেখান থেকে শুরু)। এই দুই অক্ষ থেকে ক্ষুদ্রতম দূরত্বের হিসাব করে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্দিষ্ট করা যায়। যে মুহূর্তে আমরা ঐ বস্তুর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকা রেখার থেকে দূরত্ব মাপতে পারি, সেই মুহূর্তে তাকে পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত অক্ষ থেকেও মাপা যাবে। এই দুটি মাপ এক সাথে হবে। কেউ কারোর থেকে আলাদা হতে পারবে না। এর মানে যে মুহূর্তে একটি অক্ষ থেকে মাপ নেওয়া সম্ভব হবে, সেই মুহূর্তে শুধুমাত্র ঐ একটিই মাপ নেওয়া যাবে এটা কখনো সম্ভব নয়। অন্য অক্ষ থেকে দূরত্ব তখনই মাপতে হবে তার অবস্থান বুঝতে। যদি বস্তুটি ত্রিমাত্রিক স্থানে (স্পেসে) থাকে তখন এই ব্যাপারটা তিনটে অক্ষের ক্ষেত্রে সত্য হবে। এক্ষেত্রে তিনটে স্থানাঙ্কই একসাথে পাবো এবং তাই দিয়ে ছাড়া সেই বস্তুর সঠিক অবস্থান বুঝবো না। এই তিনটি স্থানাঙ্কের বাইরে আর কোনো অঙ্ক থাকতে পারে কিনা, এমন চিন্তা গ্যালিলিও-কেপলারের আমলে, এমনকী নিউটনের আমলেও কেউ করেনি। কারণ এর প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয় নি। কিন্তু গতিশীল বস্তু এখন যেখানে আছে সময়ান্তরে অন্য কোন্ অবস্থানে গেল, তা হিসাব করার সময়, সময়ের পরিমাপ করা হত। সময় মাপার জন্য ভালো ঘড়ির আবিষ্কার হওয়ায় তা অনেকটা সঠিক হতো। যেমন স্টপ ওয়াচের ব্যবহার করলে আমরা খুব নিখুঁত ভাবে এই কাজটা সমাধা করি। কিন্তু গতিশীল বস্তুটা একেবারে শুরুতে কোথায় ছিল? বা বস্তুর অবস্থান মাপার মূলবিন্দুটা একেবারে শুরুতে কোথায় ছিল জানা ছিল না। অর্থাৎ এই জগতের (স্পেসের) কিনারাটা কোথায়, তা জানা ছিল না। যদিও সূর্যকেন্দ্রীক কোপার্নিকাসের বিশ্বজগতে গতিশীল পৃথিবীর সবকিছুই গতিশীল হওয়ায় এই প্রশ্নগুলো আসাটা অবধারিত হল। এক্ষেত্রে বস্তুর দুটি পরপর অবস্থানের মধ্যবর্তী পর্যায়টাকে সময়ান্তর বলছি। কিন্তু স্পেসের কিনারার মতো সময়ের শুরুটা জানা ছিল না, এ নিয়ে ভাবার প্রয়োজন হয় নি।

বস্তুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে তার অবস্থান বার করার জ্যামিতিকে বলে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি। এই জ্যামিতিও ইউক্লিডিও জ্যামিতি। এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সাহায্যে এবার আমরা একটি জড় সাপেক্ষ ফ্রেম থেকে অন্য একটি জড় সাপেক্ষ ফ্রেমে গতিশীল বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করবো। একটি সাপেক্ষ ফ্রেমের সাপেক্ষে যেহেতু অন্য সাপেক্ষ ফ্রেমের বস্তুকে দেখা হচ্ছে, তাই এই ঘটনাকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন। গ্যালিলিও যে ট্রান্সফরমেশন দেখিয়েছিলেন তাই এবার আমরা আলোচনা করছি। একে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশনও বলা হয়। ধরা যাক দুটি সাপেক্ষ কাঠামো আছে, একটি S_1 এবং অন্যটি S_2

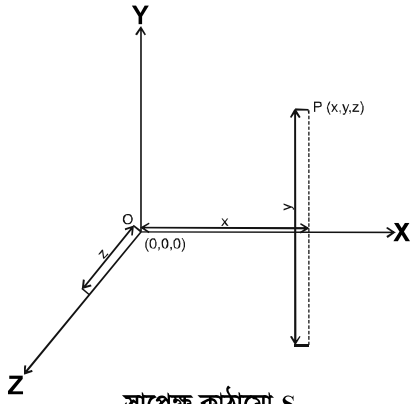

সাপেক্ষ কাঠামো S_1

সাপেক্ষ কাঠামো S_1 ঃ

এখানে একটি বিন্দু P যার স্থানাঙ্ক (x, y, z)। সাপেক্ষ কাঠামো S_1-এ মূলবিন্দু O। 'O' বিন্দুতে স্থানাঙ্ক (o,o,o)। OZ এবং OX রেখার অন্তর্ভুক্ত সমতল (XZ তল)। একই নিয়মে আমরা পাই YZ, XY সমতল। এখন XZ তলের সাথে সমকোণে আঁকা সরলরেখার দৈর্ঘ্য y এটি OY রেখার উপর y পরিমাণের। OX রেখার উপর P বিন্দু থেকে আঁকা লম্ব হল x। এইভাবে তিনটি অক্ষ OX, OY এবং OZ এর উপর যথাক্রমে x, y এবং z মাপ পাবো। এখানে O থেকে P বিন্দুকে দেখা হচ্ছে।

সাপেক্ষ কাঠামো S_2 ঃ এক্ষেত্রে মূল বিন্দুটি O^1, তিনটি অক্ষ O^1X^1, O^1Y^1 এবং O^1Z^1 যদি দুটি সাপেক্ষ কাঠামোর একটিকে, অপরটির উপর সমাপতন ঘটানো হয়, তবে O এবং O^1 একই বিন্দুতে থাকবে। তখন OX এবং OX^1 সমাপতিত হবে। একই নিয়মে OY, OY^1 এর সাথে OZ, OZ^1 এর সাথে সমাপতিত হবে। এক্ষেত্রে মনে করতে হবে O বিন্দু থেকে যে ব্যক্তি P বিন্দুকে দেখছেন, O^1 বিন্দু থেকেও তিনি একই সময় P বিন্দুকে দেখছেন। গ্যালিলিওর ঐ উদাহরণ অনুসারে S_2 যদি চলন্ত জাহাজটা হয় এবং S_1 পৃথিবী। জাহাজটা চলতে শুরু করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্থির ছিল। তখন S_1 এবং S_2 একই। অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে বসে P বিন্দুকে দেখা আর জাহাজে বসে দেখা – একই ব্যাপার। (কারণ ধরে নেওয়া হচ্ছে পৃথিবী ও জাহাজ সেই মুহূর্তে স্থির। সূর্য প্রদক্ষিণরত পৃথিবীকে ধরলে সৌরজগৎ হবে তৃতীয় সাপেক্ষ কাঠামো। এক্ষেত্রে সাময়িকভাবে

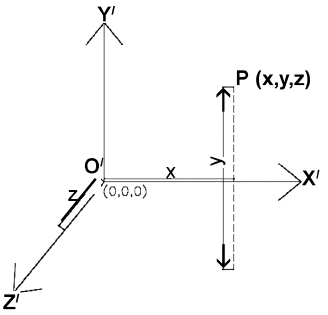

সাপেক্ষ কাঠামো S_2

সেই অবস্থাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে)

এবার P বিন্দুটি v গতিবেগে OX বা OX^1 বরাবর চলতে শুরু করল। যদি t সময়ান্তরে পরিস্থিতি বিচার করা হয় তবে নীচের ছবিটা পাবো।

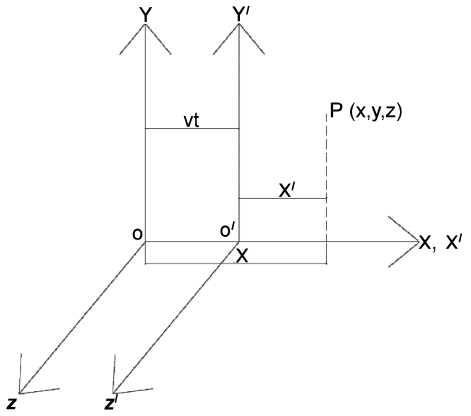

গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন

P বিন্দুটি t সময়ে vt দূরত্ব O^1 X^1 অক্ষ বরাবর এগোবে। কিন্তু অন্য অক্ষ বরাবর স্থানাঙ্কগুলো অপরিবর্তিত থাকবে (অর্থাৎ y^1 এবং z^1)

t সময়ান্তরে $y = y^1$

$z = z^1$

এবং $x = x^1 + vt$

একে উল্টে লেখা যায় $x^1 = x - vt$

$y^1 = y$

$z^1 = z$

একেই গ্যালিলিও ট্রান্সফরমেশন বলে।

যদি P বিন্দুটি 5 কিমি/সেকেন্ড বেগে গতিশীল হয়। তবে পৃথিবী থেকে এক সেকেন্ড পরে দেখলে তাকে 5 km OX বরাবর চলে গেছে মনে হবে না, মনে হবে 5+ (জাহাজ এক সেকেন্ডে যতটা গেছে) বলে মনে হবে।

এই গ্যালিলিয় ট্রান্সফরমেশন আপাত দৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হয়, কিন্তু এখানে দুটি সাপেক্ষ কাঠামো S_1 এবং S_2 তে সময় একই ধরা হচ্ছে। আমরা পরবর্তীকালে দেখবো দুটি সাপেক্ষ কাঠামোতে সময় এক না হলে, (যদি সেটা লক্ষ্যণীয়ভাবে বোঝা যায়) এই ট্রান্সফরমেশন বেঠিক হবে। তবে সে যুগ এসেছিল মানুষের বুদ্ধিমত্তার আরো অনেক বিকাশের ফলে। আপাতত ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে আসি। গ্যালিলিও এই বছর 'ইল বিলানসেত্তা' (Il Bilansetta) নামে একটি পদার্থ বিজ্ঞানের বই রচনা করলেন। এই সময় পতনশীল বস্তুর গতি সম্পর্কে – অ্যারিস্টটলের ধারণাকে পরীক্ষার দ্বারা তিনি ভুল প্রমাণ করেন। পিসার এক হেলানো মিনার থেকে দুটি ভিন্ন ওজনের বস্তু ফেলে তিনি নাকি একটা পরীক্ষা করেছিলেন জনসমক্ষে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে। বলা হয়ে থাকে তিনি এভাবে অ্যারিস্টটলের চিন্তা থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে বর্তমানকালের বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস (যিনি সাম্প্রতিককালে মারা গেছেন) কী বলেছেন, তা হুবহু তুলে ধরলাম –

... 'বস্তুপিন্ডগুলির গতি সম্পর্কে আমাদের আধুনিক ধারণার সূত্রপাত গ্যালিলিও এবং নিউটন থেকে। তার আগে লোকে বিশ্বাস করত অ্যারিস্টটলকে। তিনি বলেছিলেন, বস্তুপিন্ডের স্বাভাবিক অবস্থা স্থিতি এবং সে গতিশীল হয় শুধুমাত্র কোনো বল বা ঘাতের (impulse) দ্বারা। এ মতের ফলশ্রুতি হল একটি হাল্কা বস্তুপিন্ডের তুলনায় একটি ভারি বস্তুপিন্ডের পতন দ্রুততর হবে। তার কারণ পৃথিবীর প্রতি তার আকর্ষণ বেশী।

এছাড়াও অ্যারিস্টটলের ঐতিহ্য বলে, বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যেই মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রনকারী সমস্ত বিধি (law) গঠন করা যায়। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ব্যপারটা মিলিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং, গ্যালিলিওর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ওজনের বস্তুপিন্ডগুলির গতিবেগ বিভিন্ন কিনা – সেটা দেখার জন্য কেউ ব্যস্ত হয়নি। কথিত আছে পিসার হেলানো স্তম্ভ থেকে একাধিক ওজন ফেলে গ্যালিলিও প্রমাণ করেছিলেন অ্যারিস্টটলের ধারণা ভুল। কাহিনীটা যে অসত্য সেটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু গ্যালিলিও এই ধরণের একটা কিছু করেছিলেন। তিনি একটি ঢালু মসৃণ পথে বিভিন্ন ওজনের বল গড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরিস্থিতিটা ভারি বস্তুপিন্ডের উল্লম্বভাবে (vertically) পতনের মতো। কিন্তু

ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করা সহজতর, তার কারণ গতিবেগ তুলনায় কম। গ্যালিলিওর মাপনে দেখা গেল ওজন যাই হোক না কেন সেটাকে যদি এখন একটা ঢালু পথে ছেড়ে দেওয়া হয়, যার ঢাল প্রতি দশমিটারে এক মিটার তা হলে এক সেকেন্ডের পর বলটির দ্রুতি (speed) সেকেন্ডে একমিটার হবে, দ্বিতীয় সেকেন্ডের পর দ্রুতি হবে প্রতি সেকেন্ডে দুই মিটার এবং এই রকম চলতে থাকবে।' ...

(কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – স্টিফেন হকিংস। পৃষ্ঠা - ৩৩ থেকে ৩৪)

অন্য একটা সূত্রে আমরা জানতে পারছি যে অ্যারিস্টটলের ধারণায় আঘাত পড়ায় গ্যালিলিও পিসা ছাড়তে বাধ্য হন। বিশুদ্ধ চিন্তার উপর নির্ভরতা মানুষ এভাবে ত্যাগ করল। পরীক্ষা – পর্যবেক্ষণ দ্বারা পূরাণো ধারণাকে যাচাই করল। নতুন সিদ্ধান্ত জন্ম দিল নতুন ধারণার। এটাই বস্তুর বিকাশের নিয়ম জানার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তাই এঙ্গেলস্ ঠিকই বলেছিলেন, যে এতোকাল বিজ্ঞান সত্যিকারের বিজ্ঞানই ছিল না। এই যুগে এসে বিজ্ঞান নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করল।

গ্যালিলিও এরপর ফ্লোরেন্সে চলে আসেন। এখানে পাদুয়ায় গণিত বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপকের চাকরী করা কালীন তিনি আনত তলের পরীক্ষাটি করেছিলেন।

গ্যালিলিওর সমসাময়িক জার্মান জ্যোর্তিবিজ্ঞানী কেপলার অ্যারিস্টটলের ধারণার বাইরে কোপার্নিকাসের দেওয়া বিশ্বজগতের ধারণাকে গ্রহণ করলেন কিছুটা সংশোধন করে। কী সেই সংশোধন? কেপলার বললেন যে সূর্যকেন্দ্রীক আবর্তমান গ্রহগুলোর ঘূর্ণনপথ বৃত্তাকার নয়, সেগুলো উপবৃত্তাকার। যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। বৃত্তাকার কক্ষপথে কেন্দ্র একটি, যেখান থেকে ঘূর্ণায়মান বস্তুর দূরত্ব সর্বদা অভিন্ন থাকে। উপবৃত্তের এরকম দুটি ফোকাস বা নাভি থাকে।

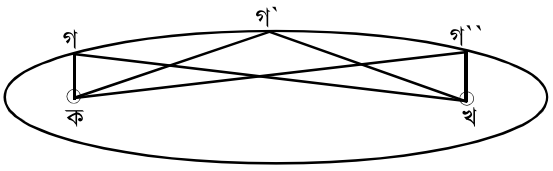

উপরে আঁকা কক্ষপথটির উপর যেকোনো তিনটি বিন্দু বেছে নিলাম। এগুলো গ, গ`, গ``, ক এবং খ হল দুটি ফোকাস। কক্ষপথটি উপবৃত্ত হবে যদি –

কগ + গখ = কগ` + গ`খ = কগ` + গ``খ হয়।

যদি 'ক' অবস্থানে সূর্য থাকে আর গ, গ`, গ`` ইত্যাদি অবস্থানে পৃথিবী বা অন্য কোনো গ্রহ থাকলে ছবিটা কল্পনা করুন।

কেপলার (১৫৭১-১৬৩০)

উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এমন ধারণা কেপলারের হয়, যখন তিনি আকাশের নক্ষত্রগুলোর বিভিন্ন অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন, তখন। কেপলারের এই ধারণার পরিবর্তন হয় পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণজাত তথ্যের বিশ্লেষণ করে। এই সময় তিনি এই উপবৃত্তের ধারণাটিকে অস্থায়ী ভাবতেন। অর্থাৎ তাঁর এ সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। অথচ কেপলারের ধারণার সাথে বারো মাসে বারো ঋতুবৈচিত্র মিলে গেল। ক্রান্তিয় অঞ্চলে (অর্থাৎ ২৩$^{১}/_{২}^{\circ}$ উত্তর থেকে ২৩$^{১}/_{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) এই তাপের প্রভাবে ঋতুপরিবর্তন লক্ষণীয়ভাবে হয়ে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতিও এই অঞ্চলে। মেরু অঞ্চল ও তার সংলগ্ন এলাকায় লোকসংখ্যা বা জীবজগৎ অত্যন্ত কম। তাই ঋতু পরিবর্তন অধিকাংশ মানুষই অনুধাবন করেছেন। পৃথিবী ঘূর্ণনকালে সূর্যের নিকটতম অবস্থানে এলে সব থেকে তাপ বেশী পায়। দূরতম অবস্থানে গেলে তুলনামূলকভাবে কম তাপ পায়। তখন শীতের প্রকোপ দেখা যায়। বিভিন্ন ঋতুতে জীববৈচিত্র আমাদের জীবনের বৈচিত্র এনেছে। আবার সমস্ত টাকে এক সুতোয় গেঁথেছে। পোকামাকড়ের – কীটপতঙ্গের – পশুপাখীর সৃষ্টি ও বিলয় এক চক্রে আবদ্ধ হয়েছে। এক কথায় একে আমরা বলি জীবনচক্র।

এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে তাপের প্রভাব আছে। এ কথা আমরা সহজেই বুঝি। কিন্তু আবহাওয়ার এই পরিবর্তন যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা কেপলারের ধারণায় পরিষ্কার হল। গ্যালিলিও কেপলারের সাথে একমত হলেন। আর মহাকাশ সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

তাপ কিংবা শব্দ এগুলোর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। কিন্তু এর কোনো আকার আমরা পাইনা। এগুলো প্রবহমান তা আমরা বুঝি। ধরা যাক কেউ গান গাইছেন। তাঁর নিকটতম শ্রোতারা গানের সুর ও কথা (দুটোই শব্দ) দিব্বি শুনছেন। কিন্তু একটু দূরে গানের সুর ভেসে আসছে। কথাগুলো ঠিক ঠাওর করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। জ্বলন্ত উনোনের সামনে তাপ নেওয়ার সময় যতটা গরম লাগে, একটু দূরে ততটা লাগে না। জ্বলন্ত বস্তু হাতে লাগলে ছেঁকা লাগে। তাপ কিংবা শব্দ এগুলো আছে, তা দূর থেকে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে এটা আমরা বুঝি। সূর্যই তাপের প্রধানতম উৎস আমাদের কাছে। সূর্য থেকে শব্দ আসছে কিনা আমরা বুঝি না। তবে তাপ, আলো এগুলো আসছে। দিন-রাত, ঋতুপরিবর্তনের সাথে কেপলারের সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের শক্তি সম্পর্কে এমন ধারণার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। শক্তি প্রবহমান, আকারহীন কোনো কিছু, স্থিরজলে ঢেউ উঠলে তা ছড়িয়ে পরে। শক্তি ঢেউ-এর আকারে ছড়িয়ে যায় কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। যেমন তাপের পরিচলন, পরিবহন হয়, তেমনই শব্দও ছড়িয়ে পরে মাধ্যমের মধ্যদিয়ে। শূন্যস্থানে আমরা কোনো শব্দ পাই না। অ্যারিস্টটলের ধারণা ছিল বায়ুশূন্য কোনো স্থান থাকা অসম্ভব। জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো ভন গুয়েরিকে প্রথম এই ধারণার বিরুদ্ধে যান। তিনি প্রায় বায়ুশূন্য একটা পাত্র তৈরী করে দেখান, তারপর মানুষের শূন্যস্থানের অস্তিত্ব আছে এমন ধারণা পোষণ সম্ভব হল।

গ্যালিলিও খোলাচোখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত এই মহাকাশ দেখে বা তার সম্পর্কে শুধু যুক্তির বিচারে ধারণায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি একখানা দূরবীণ, কাঁচ ঘষে ঘষে বানিয়ে ফেললেন। দূরবীণের আবিষ্কার গ্যালিলিওর আগেই হয়েছে, যা দিয়ে দূরের বস্তু কাছে চলে আসে বলে মনে হয়। তবে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে গ্যালিলিও-র দূরবীণ ঐতিহাসিকভাবে ভিন্ন গুরুত্ব সম্পন্ন। আলোর প্রতিসরণের নিয়মকে ব্যবহারিকভাবে তিনি বুঝতে পেরেই এটা তৈরী করতে পেরেছিলেন। মনে রাখা দরকার গ্যালিলিও-র বহুপূর্বে আরবের বণিকরা প্যালেস্টাইনের সমুদ্র সৈকতে আচমকা কাঁচের আবিষ্কার করে ফেলে। কিন্তু কাঁচ তৈরীর পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের বাইরে বহুকাল পর্যন্ত ছিল। কাঁচ তৈরী করতো যারা, তারা তা বহুদিন গোপন রেখেছিল।

বিবর্ধক কাঁচের ব্যবহার মানুষ আগেই করেছে। সাধারণভাবে দেখতে অসুবিধা হয় এমন জিনিসকে ভালো করে দেখতে এই ধরণের বিবর্ধক কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস (যে কাঁচের ব্যবহারে ছোটো জিনিসকে বিবর্ধিত বা বড় দেখায়) ব্যবহার হত। এমনই কাঁচ ঘষে ঘষে তৈরী হল দূরবীন। অনেকদূরের গ্রহ, নক্ষত্র অনেক কাছে চলে এল বলে মনে হল। মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণের সীমারেখা প্রসারিত হল। এই সীমারেখা আমরা নিম্নরূপে পাই ঃ

	সর্বনিম্ন	**সর্বোচ্চ**
তখনো পর্যন্ত মহাবিশ্বে –		
১) দৈর্ঘ্য	এক মিলিমিটারের অর্ধেকের কম (যতটা ছোট আকার বিবর্ধক কাঁচে দৃশ্যমান হয়)	পৃথিবীর পরিধি ছাড়িয়ে অনেক গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত (যাদের দূরবীণে দেখা যায়)
২) ভর	এক মিলিগ্রাম	উপরের দৈর্ঘ্য অনুসারে আনুমানিক ভর
৩) সময়	চোখের পলক (তবে ঘড়ি আবিষ্কার তার মাপ করতে পারতো কিছুটা)	জগতের গঠন সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যাওয়ায় ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার সাথে অভিজ্ঞতা মিলছিল না।

দূরবীণ দিয়ে দেখতে গিয়ে গ্যালিলিও পর্যবেক্ষণ করলেন চাঁদে বড় বড় গর্ত, ফাটল আর পাহাড় আছে। তিনি বললেন চাঁদ কোনো গ্রহ নয়, উপগ্রহ। চাঁদের মতোই অন্যান্য গ্রহগুলোরও উপগ্রহ আছে। এটা কোনো ধারণা নয়, তিনি দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। যেমন বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ বা তার চাঁদ খুঁজে পাওয়া গেল। তিনি শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে ওটা কোনো তারা নয়। তিনি চাঁদের, শুক্রের দশা পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যকার পার্থক্যও ব্যাখ্যা করলেন। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। নাম দিলেন 'দ্য স্টারি মেসেন্জার' (অর্থাৎ দূত হয়ে খবর নিয়ে আসা তারাগুলি)।

ভাবুন কী সাংঘাতিক আঘাত পড়ল ধর্মীয় বিশ্বজগতের ধারণার উপর। একে তো সূর্যকে ঘিরে গ্রহগুলো ঘুরছেই, তার উপর তাদের ঘূর্ণনপথ এক এক রকম উপবৃত্তাকার। আবার যে চাঁদ টলেমী থেকে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত গ্রহ ছিল, সে হয়ে

● *৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন*

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাকাশ গবেষণার রোজনামচা

– জন হায়দার

মহাকাশে সঞ্চিত রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। আমাদের সৌরজগতের বাইরে কি রয়েছে, কেমন দেখতে সেই স্থান – এমন কতশত প্রশ্ন মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। কিন্তু পৃথিবীতে বসে তো সেই কৌতূহল মেটার নয়, তাই যেতে হবে সেথায়। মানুষ ভাবলেই তো তা সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়িত হবার নয়। এতো আমাদের প্রতিবেশী চাঁদ নয় যে সহজে গেলাম আর ফিরে এলাম। তাই অনেক বেশি উন্নত ও শক্তিশালী মহাকাশ যান পাঠাতে হবে। অনেক দূরের পথ। গন্তব্যের দূরত্ব যত বেশি তত বেশি পাথেয় প্রয়োজন। প্রয়োজন শক্তিশালী যন্ত্রপাতি যেমন ক্যামেরা, ট্রান্সমিটার বা তথ্য পাঠানোর যন্ত্র, প্রয়োজনীয় জ্বালানী ইত্যাদি। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এমন যন্ত্রপাতি আগেই বানাতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার কার্যক্ষমতা প্রতিনিয়ত উন্নত হয়ে চলেছে। মহাকাশযানের কাজ অনুযায়ী তাদের নামও বিভিন্ন। কোনোটি **ফ্লাইবাই**, অর্থাৎ মহাকাশযানটি কোন মহাজাগতিক বস্তুর কাছ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে তার ছবি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করবে ও তা পৃথিবীতে পাঠাবে। কোনোটির নাম **অরবাইটার**, অর্থাৎ যানটি মহাজাগতিক বস্তুর চারদিকে পাক খেতে খেতে তার ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করবে। কোনটি **ইম্প্যাক্টর**, অর্থাৎ যানটি মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে সংর্ঘষ করবে ও সংঘর্ষকালে যাবতীয় তথ্য ও ছবি পাঠাবে। আবার কোনটির নাম **রোভার**, অর্থাৎ মহাকাশযানটি মহাজাগতিক বস্তুর পৃষ্ঠে অবতরণ করে ঘুরে বেড়াবে ও ছবি, তথ্য, নমুনা সংগ্রহ করে পাঠাবে গবেষণার জন্য।

যাই হোক, সৌরজগতের শেষ প্রান্তে কি রয়েছে তা জানার তাগিদ থেকেই ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা একটি মহাকাশ যান পাঠায় যার নাম **নিউ হরাইজন**, অর্থাৎ **'নব দিগন্ত'**। দীর্ঘদিনের গবেষণায় নির্মিত মহাকাশ যানটিতে রয়েছে অসংখ্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি যা দীর্ঘদিন নিখুঁতভাবে সক্রিয়তা বজায় রাখতে সক্ষম। এই দীর্ঘ পথ চলতে চলতে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই জুলাই তা 'বামনগ্রহ' প্লুটোর কাছে পৌঁছায় ও অজস্র ছবি ও পর্যবেক্ষণ পাঠায়। সেই তথ্য থেকে প্লুটো ও তার চারদিকে ঘুরতে থাকা পাঁচটি 'চাঁদ' সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা গিয়েছিল। জানা গিয়েছিল ইউরেনাস পরবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধে, যার নাম **'কুইপার বেল্ট'**। এই অঞ্চলের মহাজাগতিক বস্তুর ঘনত্ব এতটাই

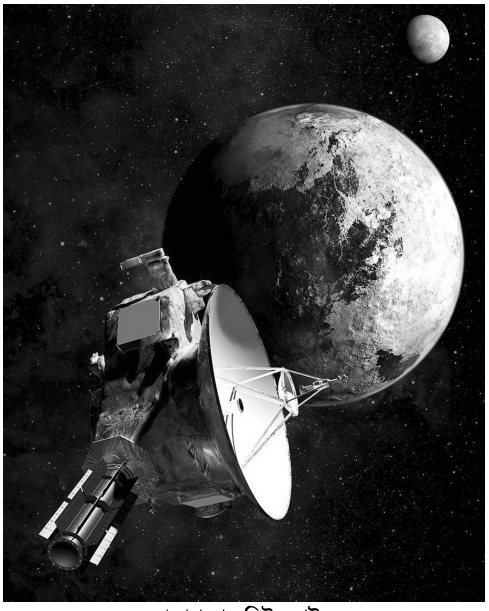

মহাকাশ যান নিউ হরাইজন

বেশি যে, ঐ বস্তুমন্ডলীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাত চলতে থাকে। এমনকি ঐ বস্তুগুলির সঙ্গে প্লুটো ও তার চাঁদগুলির সঙ্গে অবিরত সংঘর্ষ চলে।

প্রাথমিকভাবে, নিউ হরাইজন-এর লক্ষ্য প্লুটোর কাছাকাছি পৌঁছানো হলেও পরবর্তীকালে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন, নিউ হরাইজনের পাঠানো ছবি ও তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা কুইপার বেল্ট অঞ্চলে একটি মহাজাগতিক বস্তুর সন্ধান পান যার নাম রাখা হয় – **'আল্টিমা থুলি'**। এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা মহাকাশযানের যন্ত্রপাতির ক্ষমতা ও অবশিষ্ট পারমাণবিক জ্বালানীর বিষয় মাথায় রেখে, পরবর্তীতে লক্ষ্য স্থির করেন যার নাম **মিশন ফ্লাইবাই আল্টিমা থুলি**। আল্টিমা থুলি অর্থাৎ জ্ঞাত কিনারের বাইরে অর্থাৎ অজানা অঞ্চল। সেদিন যা ছিল অজ্ঞাত বর্তমানে তা জ্ঞাত। হ্যাঁ, গত ১লা জানুয়ারি, ২০১৯ সে পৃথিবী হতে প্রায় ৬০০ কোটি কিমি দূরে, নিউ হরাইজন আল্টিমা থুলি'র কাছ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে অজস্র ছবি পাঠিয়েছে যা মাদ্রিদের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন ও উল্লসিত হয়ে পড়েন। উল্লাসের কারণ

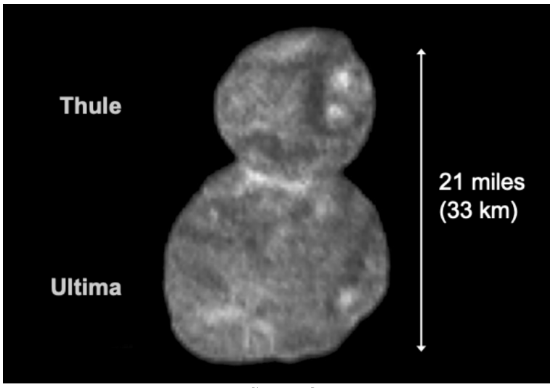

আল্টিমা থুলি

হল, এটাই প্রথম মনুষ্য নির্মিত মহাকাশযান যা এতটা দূরবর্তী স্থান থেকে পৃথিবীতে তথ্য পাঠাতে সক্ষম হল।

বর্তমানে নিউ হরাইজন 'আল্টিমা থুলি'কে প্রায় ২৫০ লক্ষ কিমি পিছনে ফেলে সেকেন্ডে প্রায় ১৪.৫ কিমি গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে এই বিশাল দূরত্বের কারণে নিউ হরাইজন থেকে পাঠানো সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছতে ক্রমশঃ বেশি সময় লাগবে। নাসার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গত ১লা জানুয়ারি, ২০১৯শে পাঠানো সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল ৬ ঘন্টা ৮ মিনিট। বর্তমানে যানটি তথ্য পাঠানোর গতি সেকেন্ডে এক কিলোবাইট (1 kbps)। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন 'আল্টিমা থুলি'র সর্বোচ্চ রিজলিউশন ছবি পৃথিবীতে পৌঁছাবে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর নাগাদ। নিউ হরাইজনে বর্তমানে যা জ্বালানী অবশিষ্ট রয়েছে তা মহাকাশ যানটিকে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্মক্ষম রাখবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। সেই অর্থে মহাকাশ যানটি এখন মধ্যবয়সী। এই দীর্ঘ পথ চলায় নিউ হরাইজনের পাঠানো তথ্যাবলী মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। যদিও মহাকাশ যানটির স্মৃতি ধারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ রয়েছে।

বর্তমানে নিউ হরাইজন এখন তৃতীয় দশায় অবস্থান করছে। উৎক্ষেপণ কাল থেকে প্লুটো'র কাছাকাছি পৌঁছানোটি হল প্রথম দশা। আল্টিমা থুলির কাছাকাছি যাওয়াটি হল দ্বিতীয় দশা। আল্টিমা থুলির পরবর্তী যাত্রাপথটিকে বলা হচ্ছে তৃতীয় দশা। বর্তমানে মহাকাশযানটির কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে তেমন কোনো বিশেষ কুইপার বেল্ট বস্তু এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। তবে নিউ হরাইজনের আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য মাঝে মাঝে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে।

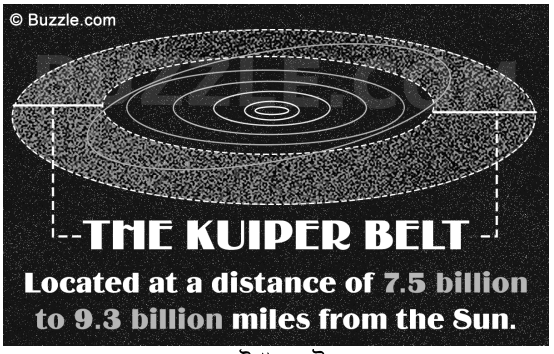

কুইপার বেল্ট

এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য কি?

* এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে ছিল প্লুটো ফ্লাইবাই। যদিও যাত্রাপথে বৃহস্পতি গ্রহ এসে যাওয়ায় নিউ হরাইজন বৃহস্পতিকে ফ্লাইবাই করে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি নাগাদ অজস্র হাই রেজলিউশন ছবি পাঠায় যা থেকে গ্রহটিকে অনেক বিশদভাবে জানা গেছে। এমনকি বৃহস্পতির বেশ কয়েকটি চাঁদের ছবি ও নতুন তথ্য প্রেরণ করে। তারপর দীর্ঘদিন নিউ হরাইজনের যন্ত্রপাতিগুলিকে মাঝে মাঝে বন্ধ করে রাখা হয় কারণ প্লুটোয় পৌঁছানোর আগে ফ্লাই বাই-এর সুযোগ থাকলেও বিজ্ঞানীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্লুটোর চাঁদ সহ প্লুটোকে জানা ও কুইপার বেল্ট সম্বন্ধে জানা।

* প্লুটো ও তার চাঁদ 'চারণ'-এর আকৃতি ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে জানা;

* প্লুটো ও 'চারণ'-এর রাসায়নিক উপাদানের মানচিত্র তৈরী করা;

* প্লুটো বায়ুমন্ডলের বৈশিষ্ট জানা।

'নাসা'র বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন প্লুটো মিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

কেন আল্টিমা থুলি?

আগেই বলা হয়েছে আল্টিমা থুলি হল কুইপার বেল্টে অবস্থিত একটি মহাজাগতিক বস্তু যা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন। আল্টিমা থুলি একটি অদ্ভুত দর্শন যমজ পাথর অর্থাৎ দুটি বৃহৎ প্রস্তর খন্ড জোড়া লেগে রয়েছে। যার ব্যাস হল ৩০ কিমি। আবার প্রস্তর খন্ড দুটি একে অপরের চারিদিকে আবর্তিত হচ্ছে। এমন ঘটনা বিজ্ঞানের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল বলে তাঁরা ঐ বস্তুটিকে আরও বিশদভাবে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন ও তাকে লক্ষ্য

করে নিউ হরাইজনকে চালিত করেন। 'আল্টিমা থুলি'কে পর্যবেক্ষণ করে প্রাথমিক ভাবে বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে এটি একটি অতিপ্রাচীন বাদামী বর্ণের বস্তু যা কুইপার বেল্ট বস্তুমন্ডলীর মধ্যে প্রাচীনতম। অর্থাৎ **আল্টিমা থুলির গঠন, তার উপাদান, তার ভূতত্ত্ব আমাদের সৌরজগত সৃষ্টির সময়কালকে চিহ্নিত করতে পারে। এমনকি আমাদের সৌরজগত সৃষ্টি রহস্যের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এই আল্টিমা থুলি।** বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে এবং সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। মহাজাগতিক বস্তু মন্ডলীর ঘূর্ণন পথ সাধারণত উপবৃত্তাকার হলেও আল্টিমা থুলির তা বৃত্তাকার। নিউ হরাইজন মিশন বা অভিযান মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণার এক অভূতপূর্ব সাফল্য। বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনাকে সফল করে সে এখন পাড়ি দিয়েছে মহাকাশের অতল অন্ধকারে। তার চোখ দিয়ে পৃথিবীর মানুষ দেখবে বহির্বিশ্বকে। কত শত অজানা, অদেখা বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। কুইপার বেল্টে ঠাসাঠাসি ঘুরতে থাকা লক্ষ কোটি বস্তুমন্ডলী সম্বন্ধে সে প্রায় প্রতিদিনই পাঠাবে নতুন নতুন তথ্য, ছবি। এমনিভাবেই চলতে থাকবে মহাকাশ গবেষণার রোজ নামচা। (ক্রমশ) ■

চিঠিপত্র ঃ

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকা পড়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, বিশেষ করে মহাকাশ সম্পর্কে। সূর্য সম্পর্কে আমার আরও অনেক জানার ইচ্ছা আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখা হলে ভাল হয়।

নিবেদিতা মন্ডল

বনগ্রাম, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাপিঠ

উত্তর ২৪ পরগণা

সম্পাদকের মতামত

পত্রিকা পড়ে তোমাদের যাবতীয় প্রশ্ন লিখে পাঠাও এবং তোমার বন্ধুদেরও পত্রিকা পড়াও।

২৭ পৃষ্ঠার পর

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

গেল পৃথিবীর উপগ্রহ। অন্যান্য গ্রহগুলোরও উপগ্রহ আছে তা জানা গেল। এসব আবার একটা শয়তানের যন্ত্রে (দূরবীণে) দেখাও যায়। এসব যা কিছু দেখা যাচ্ছে, তার থেকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী জীব-নির্জীব জগৎকে দিব্বি ব্যাখ্যা করতে পারছি। ধর্মীয় স্থিতিশীল বিশ্বজগতের ধারণার উপর এক বহুমাত্রিক আলোড়ন পরে গেল।

রোমের ধর্মযাজকরা গ্যালিলিওর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখালো। চার্চের প্রতি গ্যালিলিওর ছিল গভীর আস্থা। অথচ তাঁর একের পর এক আবিষ্কার, তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সাথে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানে এনে ফেলল। গ্যালিলিওকে যখন চার্চ বিরোধী মতপ্রচারের অভিযোগে পোপের প্রতিনিধির সামনে দাঁড় করানো হল, তিনি কোপার্নিকাসের ওপর থেকে সব সমর্থন প্রত্যাহার করলেন। আবার ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকাশে তিনটি ধূমকেতু স্পষ্ট দেখলেন। এদের ব্যাখ্যা চার্চের স্থির মহাবিশ্বের ধারণায় পাওয়া সম্ভব নয়। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'দ্য অ্যাসেরার' বইটি লিখে চার্চের মতবাদ খন্ডন করলেন। পোপ চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। গ্যালিলিওকে জোর করল পুরানো সিদ্ধান্তে আসার জন্য। গ্যালিলিও লিখলেন 'ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চিফ সিস্টেমস্ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'। বই প্রকাশের সাথে সাথে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার ও গৃহবন্দী হলেন ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। বন্দী অবস্থায় তাঁর লিখিত বই নিউ সায়েন্স (নতুন বিজ্ঞান) গোপনে হল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হল। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হল গ্যালিলিওর।

গ্যালিলিওর শারীরিক মৃত্যুতে, তাঁর ভাবনা-চিন্তার কিন্তু মৃত্যু হয় নি। কীভাবে তা বেঁচে থাকলো – প্রস্ফুটিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, সেই কাহিনীতে আগামীতে আসবো।

অ্যারিস্টটল, টলেমী, কোপার্নিকাস থেকে গ্যালিলিও – প্রত্যেকে তাঁদের জীবনে যা বলেছেন বা আবিষ্কার করেছেন, তা সবার ক্ষেত্রেই বিদ্যমান ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে ধারণার থেকে একটু একটু করে সরে এসে। ফলে এরা সবাই এক স্ববিরোধের সামনাসামনি হয়েছেন। উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ, মানব মনে যে গভীর রেখাপাত করে, তার প্রতিক্রিয়ায় মানুষ এই সমাজ পরিবর্তনের সন্ধীক্ষণে এক বৈপরীত্বের সম্মুখীন হয়। (ক্রমশ)

ইতিহাসের পাতা থেকে ঃ

কাঁচ

– সুকুমার রায়

[এই রচনাটি বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সুকুমার রায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজির ১৯১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দে) অর্থাৎ প্রায় একশ বছর আগে লিখেছিলেন। রচনাটি সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান –সম্পাদক।]

এক ছিল সওদাগর। সে গেল বাণিজ্য করতে। প্যালেস্টাইনের তীরের কাছে নদীর মুখে তার ছোট্ট জাহাজটি বেঁধে সে তার লোকজন নিয়ে ডাঙায় নামল, আর সেখানেই বালির উপর আগুন জ্বেলে রান্না করতে বসল। হাঁড়ি বসাবার জন্য পাথর পাওয়া গেল না, কাজেই তাদের সঙ্গে যে সোডা-ক্ষারের পাটালি ছিল (যে সোডা দিয়ে বাসন সাফ করে) তারই কয়েকটার উপর তারা হাঁড়ি চড়াল। রান্না খাওয়া সব যখন শেষ হয়েছে, তখন তাদের সোজা-পাথরের চাক্তিগুলো তুলতে গিয়ে দেখলে তার চিহ্নমাত্র নেই – আছে কেবল স্বচ্ছ পাথরের মতন কি একটা জিনিস যা তারা আর কখনও চোখে দেখেনি। এমনি করে নাকি কাঁচের আবিষ্কার হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বালির সঙ্গে ক্ষার গলিয়ে লোকে কাঁচ তৈরি করে আসছে।

কলার 'বাসনা' পুড়িয়ে যে ছাই হয়, তার মধ্যে ক্ষার থাকে – তাকে বলে পটাশ ক্ষার। সোডা পটাশ চূন এই সমস্তই নানারকমের ক্ষার। চুল্লির আঁচে শুধু বালি কখনও গলে না; কিন্তু তার সঙ্গে চূন-পাথর আর ক্ষার মিলিয়ে জ্বাল দিলে সব গলে এক হয়ে যায়, আর ঠান্ডা হলে কাঁচ হয়ে জমে থাকে।

প্রথম মানুষে যে কাঁচ ব্যবহার করত, সে কেবল সৌখিন জিনিস হিসাবে। কাঁচ তৈরি করবার সময় তার সঙ্গে নানারকম ধাতুর মশলা মিশিয়ে তাতে নানারকম রং ফলান যায়। সেই সমস্ত রঙিন কাঁচের পুঁথিমুক্তো এক সময়ে লোকে অসম্ভব দামে কিনে নিত। বহুমূল্য রত্ন বলে দেশ বিদেশে তার আদর হত। সে সময়ে কাঁচ তৈরীর সংকেত খুব অল্প লোকেই জানত; আর তারা কাউকে সেসব শেখাত না। কিন্তু তবু দুশ পাঁচশ বা হাজার বছরে সেসব গোপন কথাও অল্পে অল্পে ফাঁস হয়ে যেতে লাগল। ক্রমে এশিয়া থেকে ইউরোপের নানা স্থানে এ বিদ্যার চলন হতে লাগল। বুদ্ধিমান রোমানেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচ তৈরিতে এমন উন্নতি করে ফেলল যে, কয়েক শ বছরের মধ্যেই কাঁচের সারসি, বাসন, প্রদীপ-দান প্রভৃতি মানুষের – অন্তত ধনী লোকদের – নিত্য ব্যবহারের জিনিস হয়ে দাঁড়াল।

এখন আমরা যে সমস্ত ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার কাঁচ সদা সর্বদা ব্যবহার করি, তিনশ বছর আগে সেরকম কাঁচ তৈরিই হত না। সে সময়কার কাঁচ হত ময়লাগোছের, তার মাঝে মাঝে ঘোলাটে দাগ থাকত। তার উপরেই রং ফলিয়ে, কৌশলে তার দাগের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে ওস্তাদ করিকরেরা আশ্চর্য সুন্দর সব জিনিস গড়ত। কিন্তু নিখুঁৎ সাদা কাঁচ যে কাকে বলে, সে তারা জানতই না। প্রায় তিনশ বছর আগে ইংলন্ডের কয়েকজন উৎসাহী লোকের চেষ্টায় একরকম চমৎকার কাঁচ তৈরি হয়, সেই থেকেই কাঁচের ব্যবসার চূড়ান্ত উন্নতির আরম্ভ। তার আগে কাঠের চুল্লিতে কাঁচ তৈরি হত, এই ইংরাজেরাই সকলের আগে কয়লার চুল্লি ব্যবহার করলেন। এঁরা সমুদ্রের পানা পুড়িয়ে, তা থেকে পটাশ বার করে, সেই পটাশের মধ্যে খাঁটি চক্‌মকি পাথরের গুঁড়ো আর সীসা-ভস্ম মিশিয়ে জলের মতো স্বচ্ছ নূতন রকমের কাঁচ তৈরি করলেন। তখন হতে সেই কাঁচের সারসি, সেই কাঁচের আরসি, সেই কাঁচের যন্ত্র বাসন চশমা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সৌখিন ধনীর সখের কাঁচ সাধারণ লোকের ঘরোয়া জিনিস হয়ে উঠল।

লোহা না থাকলে মানুষের সভ্যতার শক্তি যেমন খোঁড়া হয়ে যায়, কাঁচ না থাকলেও বিজ্ঞানের বুদ্ধিও সেইরকম কানা হয়ে পড়ে। এই তিনশ বছরের মানুষ তার জ্ঞানের পথে যা কিছু উন্নতি ও আবিষ্কার করেছে, কাঁচ না থাকলে তার প্রায় বারো আনাই অসম্ভব হত। কাঁচ ছিল তাই দূরবীণ হতে পেরেছে; কাঁচ ছিল তাই অণুবীক্ষণের জন্ম হয়েছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের আশ্চর্য রহস্য, গাছপালা কীট-পতঙ্গের গঠন কৌশল, অসংখ্য রোগবীজের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিত্য লড়াই, অতি বড় ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব আর অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর ইতিহাস – এ সমস্তই মানুষ জানতে পারছে কেবল কাঁচের কৃপায়। গ্রহ নক্ষত্রের আলোক দেখে পন্ডিতে তার মালমশলার বিচার করেন, তার ভূত-ভবিষ্যৎ কত কি বলেন, – তার জন্য কাঁচের বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র চাই। ফটোগ্রাফার ছবি তোলেন, তার জন্য কাঁচের লেন্স চাই। বৈজ্ঞানিকের ঘরে ঘরে কাঁচের থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, আরো নানারকম কত যন্ত্র আর কত 'মিটার'। মোট কথা, কাঁচের ব্যবহার যদি মানুষে না জানত তবে আজও তার সভ্যতার ইতিহাস অন্তত তিনশ বছর পেছিয়ে থাকত।

নানারকম কাজের জন্য নানারকম কাঁচ তৈরি হয়। তা থেকে কাজের জিনিস গড়বার উপায়ও নানারকম। সামান্য একটা গেলাস বোতল চিম্‌নি বা কাঁচের নল বানাবার জন্য কত যে কায়দা কৌশলের দরকার হয়, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। একটি কারিকর একটা লোহার নলে করে খানিকটা গলা কাঁচ নিয়ে, তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে, তাকে নেড়ে ঝেড়ে দুলিয়ে ঝুলিয়ে চট্‌পট্ কত যে

আশ্চর্য জিনিস গড়তে পারে, সে একটা দেখবার মতো ব্যাপার। নলের মুখটা চুল্লিতে-চড়ান তরল কাঁচের মধ্যে ডুবিয়ে তুললে নলের আগায় খানিকটা গলা কাঁচ উঠে আসে। তখন সেই নলের মধ্যে ফুঁ দিলে কাঁচটা গোল বুদ্‌বুদের মতো ফাঁপা হয়ে ফুলে ওঠে। নরম থাকতে থাকতে সেই বুদ্‌বুদটাকে লোহার টেবিলের উপর ইচ্ছামত চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা যায়; অথবা গড়িয়ে ডিমের মতন বা হুঁকোর মালার মতন লম্বাটে করে দেওয়া যায়। কোন জিনিস গড়তে গড়তে,তার খানিকটা জায়গা আগুনে তাতিয়ে আবার যদি ফুঁ দেওয়া যায় তাহলে সেই তাতান জায়গাটুকু গম্বুজের মতো ফুলে উঠতে থাকে। কিংবা যদি সেটাকে নরম অবস্থায় ঝুলিয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘোলমউনির মতন পাক দেওয়া যায়, তাহলে যেখানটা নরম সেটা চিমনির ডাঁটা বা নলের মতন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। গোল জিনিসের গোড়ায় একটু নল বানিয়ে, তারপর আগার দিকটা গরম করে ফুঁয়ের জোরে ফাটিয়ে দিলে খাসা একটি বোতলের মুখ বা কলকে তৈরি হয়। এই সমস্ত নানারকম জিনিসের গায়ে আবার খানিক নরম কাঁচ লাগিয়ে ইচ্ছামত হাতল বা পায়া গড়ে দেওয়া যায়। এসব শিখতে যা সময় লাগছে, গড়তে গেলে ওস্তাদ লোকের তার চাইতেও কম সময় লাগে।

এইরকম অনেক জিনিসই আজকাল কলে তৈরি হয়। তার কতক গড়ে ঢালাই করে, কতক বানায় কল দিয়ে বাতাস ফুঁকে, আবার কতকগুলো তৈরি হয় নরম কাঁচের উপর অস্ত্র চালিয়ে। সাধারণ সরাসরি কাঁচ সমস্তই আগে অনেক হাঙ্গাম করে হাতে গড়ে তৈরি হত। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার সারসি সেইরকমে তৈরি হয়। তার জন্য প্রথমে ঘাড়-কাটা বোতলের মতো মস্ত মস্ত চোঙা বানিয়ে তারপর সেইগুলোকে কেটে চিরে, নরম করে, চেপ্টিয়ে ছোটবড় সারসি তৈরি হয়। কিন্তু খুব বড় বড় আরসি ভারি ভারি আসবাবী আয়নাগুলি প্রায় সমস্তই হয় ঢালাই করে। চুল্লির তরল কাঁচ গামলার মতো প্রকান্ড 'রোলার' দিয়ে সেই গরম কাঁচকে ক্রমাগত বেলে এবং দলে, শেষে পালিশ-কলে ঘষে সমান করতে হয়।

সব চাইতে ভাল আর দামী যে কাঁচ সেগুলো দরকার হয় বিজ্ঞানের কাজে তা দিয়ে দূরবীণ হয়, ফটো তুলবার 'লেন্স' হয়, হাজাররকম যন্ত্র তৈরি হয়। এইসব কাজের জন্য যে কাঁচ লাগে, সে কাঁচ একেবারে নিখুঁৎ হওয়া দরকার। তার আগাগোড়া সমান স্বচ্ছ হওয়া চাই। জলের মধ্যে নূন ফেললে সে নূন যেমন গলে গিয়ে সমস্তটা জলের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে কাঁচের সমস্ত মশলাগুলি সব জায়গায় ঠিক সমানভাবে সমান ওজনে মিশে যাওয়া চাই। তা যদি না হয়, কাঁচের মধ্যে কোথাও যদি অতি সামান্য একটুখানিও দাগী বা ঘোলা থেকে যায়, তাহলেই আর তা দিয়ে কোন সূক্ষ্ম কাজ চলতে পারবে না। সুতরাং এই কাঁচ তৈরি করবার সময় খুব সাবধান হতে হয়। কয়লা বা গ্যাসের চুল্লির উপর পাথুরে মাটির বাসনের মধ্যে অল্প আঁচে একটু একটু করে কাঁচের মশলা জ্বাল দিতে হয়। দশ বারো ঘন্টা জ্বাল দেবার পর, চুল্লির আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে খুব কড়া আঁচের তাপে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা রাখতে হয়। তারপর 'asbestos' বা রেশমী পাথরের পোশাক-পরা মজুরেরা পাথরের ডান্ডা দিয়ে সেই তরল গরম কাঁচটাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ক্রমাগত ঘুঁটতে থাকে। একে আগুনের মতো গরম, তার উপর এই ভীষণ পরিশ্রম – এক মিনিট থামবার যো নেই। মজুরের পর মজুর আসে, তারা ঘেমে হাঁপিয়ে হয়রান হয়ে পড়ে, তাদের ঘারে পিঠে ব্যথা হয়ে যায়, আবার তাদের জায়গায় নূতন মজুর আসে। ক্রমে চুল্লির আগুনও আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে – কাঁচটাও অল্পে অল্পে ঠান্ডা হয়ে জমে আসতে থাকে। এই সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে গেলে সবটা কাঁচ ঠিক সমানভাবে জমতে পারে না – এলোমেলোভাবে জমাট বেঁধে কাঁচের মধ্যে নানারকম 'টান' ধরে যায়; সে দোষ চোখে দেখা না গেলেও কাজের সময় ধরা পড়ে। সাধারণ কাঁচের জিনিসও তৈরি করার সময়ে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে ফেললে ঠুনকো হয়ে যায়, নাড়তে-চাড়তে সহজেই ভেঙে যায়। তাই, কাঁচ যখন জমে আসতে থাকে তখনই চুল্লির চারদিকে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে সব বুজিয়ে দিতে হয়; তার মধ্যে চুল্লির আগুন আস্তে আস্তে নিভে যায়। কাঁচটাও পাঁচদিন দশদিন বা পনেরদিন ধরে অল্পে অল্পে জমাট বেঁধে ঠান্ডা হয়ে আসে। সে কাঁচ যদি আস্ত থাকে তাহলে কাঁচওয়ালার খুব ভাগ্য বলতে হবে। প্রায়ই সেগুলো আট দশ টুকরো হয়ে ভাঙা অবস্থায় বেরোয় – তার মধ্যে ভাল ভাল টুকরোগুলো বেছে নিতে হয়।

বড় বড় দূরবীণের জন্য দু হাত তিন হাত বা তার চাইতেও চওড়া নিখুঁৎ কাঁচের চাক্তির দরকার হয়। সেরকম কাঁচ করবার মতো কারিকর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর যত বড় বড় দূরবীণ তার প্রায় সমস্তগুলিরই কাঁচ ঢালাই হয় ফ্রান্সের একটিমাত্র কারখানায়। সেখানে গরম পাত্রে গরম কাঁচ ঢেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আস্তে আস্তে চুল্লি জুড়িয়ে, নানারকম তোয়াজ করে, তারপর কাঁচখানাকে বার করা হয়। তবু প্রায়ই দেখা যায় কাঁচ ফেটে চৌচির হয়ে আছে। এইরকমে বার বার ঢালাই করে, বার বার ভেঙে যায়। হয়ত বিশ-ত্রিশবার চেষ্টা করে তারপর একখানি নিখুঁৎ কাঁচ বেরোয়। এইজন্যেই সে কাঁচের এত দাম; এক একখানি কাঁচের জন্য দশ বিশ হাজার বা লাখ দুই লাখ টাকা দাম লেগে যায়! আমেরিকার একটি প্রকান্ড দূরবীণের জন্য সাড়ে পাঁচ হাত চওড়া একখানি কাঁচের দরকার; তার জন্য যত টাকাই লাগুক তারা তা দিতে প্রস্তুত। আজ তেরো বছর ধরে সেই কাঁচ ঢালাই করবার চেষ্টা চলছে – কিন্তু এই এতদিন পরে সবে সেদিন মাত্র শোনা গেল যে, সে কাঁচ নাকি ঢালাই হয়ে আমেরিকায় আসছে। কাঁচখানির ওজন হবে একশ কুড়ি মণ আর তার দাম নাকি প্রায় দশ লক্ষ টাকা!■

বিজ্ঞানের খবর

নভেম্বর ২০১৮ ঃ

১. ● পৃথিবীর প্রায় ১৫ লক্ষ প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রোটোজোয়া, ছত্রাকের জটিল জীবন প্রক্রিয়ার রহস্য সন্ধানের জন্য তাদের ডিএনএ-র বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে "আর্থ বায়ো-জিনোম" নামক একটি প্রোজেক্ট এর সূচনা করেছেন। তথ্যসূত্র - বিবিসি।

২. ● ইংল্যান্ড এর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাঞ্চেস্টার এর বিজ্ঞানীরা "SpiNNaker" নামক সর্ব বৃহৎ একটি মিলিয়ান কোর নিউমোফরমিক সুপারকম্পিউটার এর সুইচ অন করেছেন। তথ্যসূত্র – ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাঞ্চেস্টার।

৪. ● জিওলজিকাল সোসাইটি অফ আমেরিকার ভূ-তত্ত্ববিদরা কিউরিওসিটি রোভার থেকে প্রাপ্ত মঙ্গল এর গল কার্টার এ প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক জলের উপস্থিতির বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। তথ্যসূত্র – জিওলজিকাল সোসাইটি অফ আমেরিকা।

৫. ● পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়াতে **সিমিওলাস মিনাটাস** নামক সবথেকে ক্ষুদ্রতম বানর এর সন্ধান পাওয়া গেছে, এই প্রজাতির বানরেরা ওজনে ছিল প্রায় ৮ পাউন্ড এবং ১.২৫ কোটি বছর আগে এদের অস্তিত্ব ছিল। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

৭. ● ইন্দোনেশিয়ার বরনিউ দ্বীপে লুবাং জারজি সালেহ গুহাতে পৃথিবীর সবচাইতে পুরানো গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, এই গুহাচিত্রের আনুমানিক বয়স প্রায় ৫২০০০ বছর। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

১২. ● চীনের ইন্সটিটিউট অফ প্লাজমা ফিসিক্স এর বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন যে Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) এ কৃত্রিম সূর্য প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৌঁছেছে। তথ্যসূত্র – সিজিটিএন, চীন।

১৪. ● জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌর মণ্ডলের প্রতিবেশী নক্ষত্র, বারনার্ডের নক্ষত্র, যেটি পৃথিবী থেকে মাত্র ৬ আলোকবর্ষ দূরে, তাকে কেন্দ্র করে ঘোরা GJ 699 b নামক পৃথিবীর মত এক গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তথ্যসূত্র – বিবিসি

১৬. ● জাপানের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গবেষকরা HRP-5P নামক মানুষের মত কর্মক্ষম এক রোবটের প্রোটোটাইপ বানিয়েছেন যা কোনও বিপজ্জনক পরিবেশে ভারী কাজ করতে সক্ষম হতে পারে, এর ফলে বিপজ্জনক পরিবেশে মানুষের জায়গায় রোবটকে নিয়োজিত করা যেতে পারে। তথ্যসূত্র – ফিজওআরজি

১৯. ● নাসার পক্ষ থেকে মঙ্গল গ্রহের জেয়োরো ক্রেটার এ মার্স ২০২০ রোভার কে অবতরনের জন্য বেছে রেখেছেন। মার্স ২০২০ রোভার ১৭ই জুলাই ২০২০ তে যাত্রা শুরু করবে আর ১৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল গ্রহে অবতরন করবে। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

২২. ● ইউনিভারসিটি অফ ম্যাঞ্চেস্টারের বিজ্ঞানীরা কিডনির ক্রনিক অসুখের জন্য দায়ী ৩৫টি জিনকে চিহ্নিত করেছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকাঅ্যালার্ট।

২৫. ● চিনের বিজ্ঞানীরা এই প্রথম লুলু আর নানা নামক দুই জমজ বোনের জিন এডিট সফলভাবে করতে সফল হয়েছেন। এই দুই শিশুর জিন এডিট করার ফলে এরা এইচআইভি ভাইরাসকে প্রতিহত সক্ষম হয়েছে। তথ্যসূত্র – এমআইটি টেকনোলোজি রিভিউ।

২৬. ● নাসার ইনসাইট ল্যান্ডার নামক মহাকাশযান মঙ্গলের মাটিতে সফল ভাবে অবতরণ করেছে। এই মহাকাশয়ান দ্বারা প্রথম মঙ্গলের বায়ু মণ্ডলের আওয়াজ শোনা গেছে। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

২৭. ● ইউনিভারসিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা ফ্রিজ-ড্রায়েড পোলিও ভ্যাকসিনের বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছেন, এই ভ্যাকসিন-এর রেফ্রিজারেশান এর কোন প্রয়োজন নেই। তথ্যসূত্র – ইউরেকাঅ্যালার্ট।

৩০. ● জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের খবর অনুযায়ী এক্সট্রা গ্যালাক্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট, যা আসলে দৃশ্যমান মহাবিশ্বে আজ পর্যন্ত যত আলোর নির্গমন হয়েছে তার পরিমাপ, আর সেই পরিমাপ অনুযায়ী সেই নির্গত আলোর দ্বারা 4×10^{84} সংখ্যক ফোটন নির্গমন হয়েছে। তথ্যসূত্র - দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

ডিসেম্বর ২০১৮ ঃ

৩. ● নাসার দ্বারা পাঠানো মহাকাশযান OSIRIS-REx "বেনু" নামক সি-টাইপ অ্যাস্টেরয়েড এ অবতরণ করেছে, এবং এই অ্যাস্টেরয়েডটিতে অতীতে যে জল ছিল তারও প্রমাণ মিলেছে। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

৫. ● ইউনিভারসিটি অফ অক্সফোর্ডের পদার্থবিদরা ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি কে একটি মাত্র ঘটনা হিসাবে তুলে ধরতে পারার ব্যাপারে দাবী করেছেন, এর ফলে ১০০ বছর আগে আইনস্টাইন-এর বলে যাওয়া কসমোলজিকাল কনস্টান্ট এর স্বপক্ষে একটা দৃঢ় প্রমাণ হিসাবে পাওয়া যাবে। ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি এক করার ক্ষেত্রে নেগেটিভ মাস এর কথা ইউনিভারসিটি অফ অক্সফোর্ডের পদার্থবিদরা বলছেন, যদিও এটি এখনও একটি মডেল। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

৬. ●ব্রিটেনের ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভারসিটি, নর্থওয়েস্ট ইউনিভারসিটি ও চিনের পিকিং ইউনিভারসিটি কম্পিউটার সায়েন্টিস্টরা ইন্টারনেট এ সিকিউরিটির জন্য বহুল ব্যবহৃত "ক্যাপচা" কে মাত্র ০.০৫ সেকেন্ডে ডিকোড করতে সক্ষম অ্যালগোরিদম বার করেছেন। তথ্যসূত্র - ইউরেকা অ্যালার্ট।

৮. ● চিনের শিচ্যাং স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার থেকে চিনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চ্যাং'স-৪ নামে চাঁদের দূরতম অংশে এই প্রথম রোবট নিয়ন্ত্রিত মহাকাশযান পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। তথ্যসূত্র - বিবিসি

১০. ● নাসার দ্বারা পাঠানো মহাকাশযান ভয়জার-২, গত ৫ই নভেম্বর সৌমন্ডল ছেড়ে আরও আগে পাড়ি দিয়েছে। ১৯৭৭ সালে এই মহাকাশযানটি মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। তথ্যসূত্র বি বি সি

● ডিপ কার্বন অবজারভেটরি দ্বারা ১০ বছর গবেষণার পর জানা গেছে যে ৩ মাইল চওড়া ও সমুদ্রের উপরিতল থেকে ১.৬ মাইল গভীর অংশের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বের মধ্যে ২৩০ কোটি টন কার্বন পাওয়া গেছে। তথ্যসূত্র - দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

১৭. ● মার্কিন জ্যোতির্বিদ স্কট শেপার্ডের নেতৃত্বে জ্যোতির্বিদদের একটি দল ফারআউট নামে একটি জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার করেছেন যা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সবাচাইতে দূরবর্তী কোন জ্যোতিষ্ক, এটির দূরত্ব ১২০ এইউ, ১ এইউ = পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব। তথ্যসূত্র - ফিজওআরজি

১৭. ● চিনের নানজিং ইউনিভারসিটির গবেষকরা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচাইতে পুরানো পাখির পালক খুঁজে পেয়েছেন, এই পাখির পালকটির আনুমানিক বয়স প্রায় ২৫ কোটি বছর যা আগের প্রাপ্ত নমুনা থেকে আরও ৭ কোটি বছরের পুরানো, যদিও গবেষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই বিষয়ে আর কিছু নমুনা পরীক্ষা করতে হবে। তথ্যসূত্র – নেচার ইকোলোজি অ্যান্ড ইভোলিউশান

১৮. ● চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এর গবেষকরা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচাইতে পুরানো ফুলের খোঁজ পেয়েছেন যেটির আনুমানিক বয়স প্রায় ১৮ কোটি বছর যা আগের প্রাপ্ত নমুনা থেকে আরও ৫ কোটি বছরের পুরানো। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট।

১৯. ● নাসা দ্বারা প্রেরিত Insight lander মঙ্গলের বুকে সিসমোমিটার স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবী ছাড়া যে কোন অন্য গ্রহে সিসমোমিটার স্থাপনের এটি প্রথম ঘটনা। তথ্যসূত্র – নাসা

২৪. ● তেল আভিভ ইউনিভারসিটির গবেষকরা বায়ো-প্ল্যাস্টিক বানানোর এমন একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন যার জন্য কোন পরিশ্রুত জল বা জমির দরকার পরে না। তথ্যসূত্র – ফিজওআরজি

ভ্রম সংশোধন

সমীক্ষণ অষ্টমবর্ষ, সংখ্যা - ২, ডিসেম্বর ২০১৮, "আবিষ্কারের গল্প" কলামে প্রকাশিত "উড়োজাহাজ" রচনাটির শেষাংশে – বড় উড়োজাহাজ আকাশে ওড়ে কিভাবে? – এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে – "... ওজন+অভিকর্ষজনিত বলকে ... " ছাপা হয়েছে। এটি ছাপার ভুল নয়। এটি আমাদের নিখুঁতভাবে লেখাটি দেখার বিষয়ে গাফিলতি। কোন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ বলই ঐ বস্তুর ওজন। সুতরাং শুধুমাত্র বস্তুর ওজন বা বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ বল বললেই সঠিক হবে। লেখায় দুটি পৃথক বলের সমষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে। এটাই ভুল। আশা রাখি আগামী দিনে এইরূপ হবে না।

কুসংস্কার ও বিজ্ঞান ঃ

সত্যি ভুত – মিথ্যে ভুত

– অসীম হালদার

তাই তাই তাই,
মামার বাড়ী যাই,
মামার বাড়ী ভারী মজা
কিল চড় নাই ...

মুখে বলতাম 'কিল চড় নাই' কিন্তু মনে মনে ভাবতাম এই সঙ্গে 'পড়াশোনা'ও নাই, আর মায়ের ভোর থেকে রাত পর্যন্ত 'দৈনন্দিন খাটা-খাটনি'ও অনেকটাই নাই। ছোট বেলায় আমরা ভাইবোনেরা মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে, বিশেষ করে, স্কুল ছুটির দিনে বা বিশেষ পালা পার্বণে মামার বাড়ীতে যেতাম। সেখানে দিনের বেলা মামাতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে চুটিয়ে খেলা করতাম। আর রাত্তিরবেলা মায়ের কোল ঘেঁষে বসে সবাই মিলে ভুতের গল্প শুনতাম। ভুতের গল্প শোনার মত উপযুক্ত পরিবেশও ওখানে ছিল। আমার মামার বাড়ী 'বহড়ু' স্টেশান থেকে কিছুটা দূরের 'রামকিষ্টপুর' (রামকৃষ্ণপুর) গ্রামে। এ গ্রামের যে দিকেই তাকানো যায় শুধু গাছপালা আর গাছপালা। চারিদকে শুধু ফলের বাগান – পেয়ারা, সবেদা, লিচু, জামরুল আর আনারসের ঝোপ, আখের বন ইত্যাদিতে ঠাসা। তারই মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে গ্রামের সরু রাস্তা। দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্য্যের আলো যেন ঢুকতেই চায় না। তবে ওখানকার মাটি বেলে-জাতীয় হওয়ায় রাস্তাঘাটে বর্ষাকালেও কোনও রকম কাদা মাড়াতে হতো না। মামার বাড়ীতে বেড়াতে যেতে তাই আমার সব ঋতুতেই খুব ভালো লাগতো।

মায়ের কাছে যে সব ভুতের গল্প শুনতাম সেগুলো শুনে আমার কিন্তু যত না গা-ছম-ছম করতো তার চেয়ে বেশী আমার মনে কৌতূহল হোত। গল্প শুনতাম আর চেখের সামনে গল্পের দৃশ্যগুলো ছবির মতো ভেসে উঠত। আর ভাবতাম এগুলো কি বাস্তবে ঘটা সম্ভব!

সত্যি ভুতের গল্পের পাত্র-পাত্রীরা অর্থাৎ ভুতু-ভুতুনীরা মোটামুটি পড়ন্ত বিকেল, ভরসন্ধে অথবা রাত্তিরবেলায় দেখা দিত। তাদের কারও পা-দুটো সামনের বদলে পিছনের দিকে বাঁকানো। কেউ আবার হঠাৎ তালগাছের মতো লম্বা হয়ে যেতে পারতো। কেউ বা রান্নাঘরে বসে বসেই বাঁশের মতো লম্বা করে হাত বাড়িয়ে বাগানের লেবুগাছ থেকে লেবু পেড়ে আনতে পারতো। এরা মানুষের সামনে মানুষের বেশেই আসত। কখনও শুনেছি কোনও বাড়ীর নতুন বৌ সন্ধের মুখে এলো চুলে পুকুরঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখে ঘাটে আর একটি মেয়ে লাল-পেড়ে সাদা-শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির বৌটি তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে খানিক গল্প করলো। আর তারপরে বাড়ী ফিরবার সময় হঠাৎ খেয়াল করে দেখে ওই মেয়েটি এক মুহূর্তে কোথায় যেন ভুস করে উধাও হয়ে গেছে। বাড়ির বৌ বাড়িতে ফিরে এসে জলের বালতি ও কাঁখের কলসীটা উঠানে নামিয়ে রেখে কেমন যেন টলমল করতে লাগলো। আর তার গলার স্বর নাকী সুরে পাল্টে গেলো। বাড়ির সবাই মত দিলো নতুন বৌ-এর ওপর ভুতে ভর করেছে। ঐ পুকুরে মাস চারেক আগে একটি মেয়ে নাকি জলে ডুবে মরেছিলো। এ তারই ভুত। তার আত্মা অতৃপ্ত হয়ে ঘাড়ে চেপেছে। এর পরে যা স্বাভাবিক তাই ঘটল। বাড়ীতে আনা হোলো ভুত তাড়ানো ওঝা। সে এসেই নতুন বৌ-এর গায়ে মন্ত্রপড়া সর্ষে ছুঁড়ে আর বেশ কয়েক ঘা ঝাঁটার বাড়ি মেরে ভুত তাড়াতে লাগলো। আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে লাগলো – তুই কে, কেন এসেছিস, এক্ষুনি যাবি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন বৌটি ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে খেয়ে কাহিল অবস্থা হোলো, তখন ভুত নাকী গলায় 'যাঁচ্ছি যাঁচ্ছি' বলে বৌটিকে ছেড়ে যেতে রাজী হোলো। ওঝা বললে – তুই যে ছেড়ে চলে গেলি বুঝব কী করে? প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ হিসেবে দাঁতে করে জুতো, ঘড়া অথবা বাটনা বাটা শিল দশ হাত বয়ে নিয়ে যেতে হবে, আর আমগাছের বা অশ্বত্থগাছের একটা ডাল ভেঙে দিয়ে যেতে হবে। বৌটি দাঁতে করে পিতলের ঘড়া নিয়ে কিছুটা গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অশ্বত্থগাছের একটা ডাল মড় মড় করে ভেঙে পড়লো। এরপর বৌটির চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিতে একটু পরে তার জ্ঞান ফিরলো। আর তখন সে একেবারে স্বাভাবিকভাবে বললো – আমার কী হয়েছে?

মজার কথা হোলো, এসব নাকি সবই সত্য ঘটনা। মাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এগুলো কি তোমার নিজের চোখে দেখা? মা বলতেন – হ্যাঁ রে বাবা। শুধু আমি কেন গ্রামের প্রায় সকলেই এসব দেখেছে। বড়ো হয়ে জেনেছি নতুন বৌ-এর মতো এইসব ভুতে পাওয়া মানুষেরা আসলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী যারা মনে মনে বিশ্বাস করে ওইরকম পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে তাদের ওপর ভুতে বা অমুকের আত্মা ভর না করে পারে না। তারা তখন ভুতের মতো আচরণ করে ও নাকী সুরে

কথা বলতে শুরু করে। তাদের গায়ে তখন কিছুক্ষণের জন্য দাঁতে করে ঘড়া তোলার মতো শক্তিরও সঞ্চার হতে পারে। ছোট বেলা থেকে মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে থাকা 'ভুত' সম্বন্ধে ধারণা বা সংস্কার তাদের আচরণকে ওইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আধো অন্ধকারে কোনও মানুষের হাত বা পা ইচ্ছে মতো লম্বা বা ছোটো করতে দেখা নেহাতই দর্শন অনুভুতির অলীক বিশ্বাস বা হ্যালিউসিনেশান্ ছাড়া কিছু নয়। আবার অন্ধকার রাত্রে মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কোনও কলাগাছকে ঘোমটা পরা বৌ ভাবা বা সুপারি গাছকে লম্বা-পা ঝাঁকড়া-মাথা ভুত দাঁড়িয়ে আছে ভাবাটা ভ্রান্তদর্শন বা ইলিউশান্ ছাড়া কিছু নয়। আর, কিছু কিছু ভৌতিক কান্ডকারখানার কথা শোনা যায় যেগুলো নেহাতই গল্প। 'আমি নিজে দেখেছি' বলে প্রচারিত হয়, অথচ আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখে নি।

রামকিষ্টুপুরের মামার বাড়ী যেতে গেলে বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময়ে এবং দিনের বেলা 'বহড়ু' স্টেশান থেকে 'বাদা' অর্থাৎ চাষের খেতের উপর দিয়ে হেঁটে সর্ট-কাটে গ্রামের মধ্যে ঢোকার একটা মেঠো রাস্তা ছিল। বর্ষার সময় আর রাতের দিকে যাবার জন্যে অন্য দুটো ভদ্রগোছের রাস্তাও ছিল – একটা বাঁদিকের ছিরিপুর (শ্রীপুর) হয়ে ডানদিকে সোজা হেঁটে; আর একটা ডানদিকের বড়ু'র বাজার, হাই-ইস্কুল মাঠের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁদিকের রেললাইন পেরিয়ে 'কাগাপাড়ার মোড়' হয়ে গ্রামে ঢোকা যেত। বেশীর ভাগ সময় কাগাপাড়ার মোড় হয়েই আমাদের আসা যাওয়া হোত। এই কাগাপাড়ার মুখে একটা বড় সাইজের পঞ্চানন ঠাকুরের বিগ্রহ রাস্তার ধারে ঠাকুর-থানে বসানো ছিল। তার চোখ-দুটো ছিল বড় বড়, গায়ের রঙ ইট-লাল। ঠাকুরকে দেখে বেশ রাগী মনে হোত। সন্ধের পরে ঐ পথে একলা যেতে হলে ঐ ঠাকুরকে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করে যেতে হোত। কারণ তার পরেই ছিল রাস্তার গা-ঘেঁষে একটা প্রায় অন্ধকার ঘন বাঁশ বন। আমাদের প্রথমে ভালো করে দেখে নিতে হোত বাঁশ ঝাড়ের কোনও একটা বাঁশ রাস্তার ওপরে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়েছে কিনা। যদি পড়ে থাকতো তাহলে ওই বাঁশ ডিঙোতে গেলেই সর্বনাশ! এক পা বাঁশের ওপারে ফেলেছ কি অমনি সেই বাঁশ খাড়া হয়ে উঠে পড়বে তোমাকে শুদ্ধু। পড়ে থাকা বাঁশের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় হোল ওই বাঁশের গায়ে মুত্রত্যাগ। তাহলেই সে বাঁশ নিজে থেকেই খাড়া হয়ে রাস্তা ছেড়ে দেবে। মায়ের কাছে শোনা এই বাঁশ-গেছো-ভুতের গল্প যে কোনও বাঁশ বনের পাশ দিয়ে একলা যেতে হলে মনে বেশ ভয় ধরাত। তাই আমরা যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে, প্রায় দৌড়ে, কাগাপাড়ার ওই ভুতুড়ে জায়গাটা পার হয়ে যেতাম। তারপরে একবার যদি 'শ্রীপতি' ডাক্তারের ডাক্তারখানা পৌঁছে যেতাম, আর ভয় লাগত না। কারণ এরপরে রাস্তার ধারে ধারে লোকজনের বসবাস, একেবারে দাসপাড়ায় মামাদের বাড়ী পর্যন্ত।

আমাদের মথুরাপুরের নিজেদের গ্রামের বাড়ীতেও ভুতের উপদ্রব ছিল। তবে সবই ছিল রাতের অন্ধকারে। কখনও মাঝরাতে ছাদের ওপরে কেউ যেন একটা ড্রাম গড়াচ্ছে, এমন শব্দ হোত। যদিও আমি নিজে কখনও তা শুনিনি। দিনের বেলায় বা রাত্তিরে কোনও জোরালো টর্চের আলোয় ভুত দেখা যেত না। ভুতেদের বাসা ছিল আমাদের বড় ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছটায়। আর বাড়ীর পেছনের বাঁশঝাড়ে। বাড়ীতে আর একটা 'ব্রহ্মদৈত্য' ছিল বলে শুনেছি। তার এক পা নাকি থাকত আমাদের পুকুরপাড়ের বাদাম গাছে, আর এক পা থাকত বাড়ীর দোতলার চিলেকোঠায়। যদিও আমি তাকে কোন দিন চোখে দেখি নি। কিন্তু সে ছিল কেবল আমার কল্পনায় আর মনের সরল বিশ্বাসে। কিন্তু রাত্তিরে হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় রান্নাঘরের টালির চালের ওপর নুয়ে পড়া বাঁশঝাড়ের ঘন পাতার মধ্যে হঠাৎ ভুতেদের নড়াচড়া, বা এ-ডাল থেকে ও-ডালে যাওয়ার শব্দ আমরা স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে অনেকেই দেখেছি ও শুনেছি। তবে কোনও দিন খুঁজে দেখি নি ভুতের বদলে ওখানে কোনও 'খটাস্ জাতীয় প্রাণী' চলাফেরা করছিল কিনা।

এরপরে ধীরে ধীরে বড় হয়েছি। জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটানোর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি তাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে অতীতে ভুতেরা কোনদিন এজগতে ছিলই না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও আসবে না। তাহলে এতজন যে নিজে চোখে ভুত দেখেছেন বলে আসছেন, সে কথা কি মিথ্যে? আমি নিজেও তো কতবার ভুত দেখেছি, সেও কি মিথ্যে? এবার তবে আমার নিজের মুখে কয়েকটা সত্যি ভুতের গল্প শুনুন।

(ভুত এক) – দিনের আলোয় গো-ভুত

তখন থাকি আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের 'টমোরি মেমোরিয়াল হস্টেলে'। স্কটিশ চার্চ কলেজের হস্টেল এটা। একদিন কলেজে কী একটা সাবজেক্টের পরীক্ষা দিয়ে দুপুরবেলা হস্টেলে ফিরেছি। সোজা তিনতলায় আমার রুমে ঢুকেছি। হস্টেলের অন্য ছেলেরা তখনও কেউ খুব একটা এসে পৌঁছয় নি। রুমে ঢুকে আমি ড্রেস চেঞ্জ করার আগে কাচের জানালাটা একটু খুলে বাইরে নীচের দিকে সবে উঁকি দিয়ে তাকিয়েছি। হস্টেলের গা ঘেঁসে চলে গেছে মতিলাল

শীল লেন। নীচে সেখানে ফুটপাথে একটা ভিক্ষুক-পরিবার গল্পগুজব করতে করতে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারছে। আমি আধ-খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ওদের খাওয়া দেখছি। হঠাৎ সামনে জানালার কাচের বাইরের দিকটায় তাকাতেই শূন্যে ভেসে উঠল একটা ড্যাব ড্যাবে গরুর চোখ। হ্যাঁ, একটাই চোখ। আমার দিকে চোখটা জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে আছে। আমি ভাবলাম দুপুর বেলা ভিখিরিদের খাওয়া-দাওয়া দেখাটাই আমার উচিৎ হয় নি। তাই বোধ হয় এই গো-ভুতের আবির্ভাব। আমি ঘাবড়ে গিয়ে জানালা থেকে এক পা এক পা করে ক্রমশঃ পিছিয়ে এলাম কী আশ্চর্য্য, গরুর চোখটিও সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। খাটের এক কোণে ধপাস করে বসে পড়লাম। আমার হাত পা বুক কাঁপতে লাগল ভয়ে। কলকাতা শহরে ঠিক-দুপুর বেলায় গো-ভুত দেখলাম! এটা তো অসম্ভব ব্যাপার। এতদিনে আমি যে ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম – ভুত বলে কিছু নেই, আমার সেই বিশ্বাসকে আমি এত সহজে নষ্ট হতে দিতে পারি? কক্ষনো না। মনে মনে বললাম – 'ইনভেস্টিগেট ইট'। যতক্ষণ না রহস্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে 'অনুসন্ধান করো'। অতএব আবার উঠে দাঁড়ালাম। এলাম জানালার কাছে। সেই একই জায়গায়। আবার তাকালাম নীচের দিকে। ঠিক যে জায়গায় এবং যেমন ভাবে দাঁড়িয়ে আগে দেখছিলাম নীচের দিকে, আবার সেইভাবে কোমরে বাঁ হাতটা রেখে একই ভঙ্গীতে দাঁড়ালাম। নাহ্। কোন গরুর চোখ দেখা গেল না। এবার ধীরে ধীরে আমার শরীরটা, কোমরটা ডানদিকে বাঁদিকে একটু একটু ঘুরিয়ে দেখলাম। নাঃ, এখনও কিছু দেখা গেল না। তবু হাল ছাড়া যাবে না। নানান ভাবে আগের অবস্থায় দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ মনে হোল এক পলকের জন্যে একটা চোখের মতো কী যেন জানালার ওপারে শূন্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ভালো করে দেখতেই পেলাম না। কিন্তু ওইটুকুই আমার কাছে তখন আশার আলো। ঠিক ওই পোজ্-এ ওই জায়গায় খুব সামান্য এদিকে ওদিক করে একটু খানি শরীর নড়াতেই এবার ধরা দিলো সেই গরুর চোখ। হ্যাঁ ঠিক। এবার ভালো করে লক্ষ্য করার পালা। কী ওটা? এবারে রহস্য ভেদ হোল। আমি বাঁ হাতটা কোমরে রেখেছিলাম। এবার বাঁ হাতের কব্জিটা সামান্য নড়াতেই গরুর চোখও নড়ছে। আসলে জানালার কাচ স্বচ্ছ হলেও কাচে বেশ ধুলো জমেছে। বহুদিন পরিষ্কার করা হয় নি। তাই স্বচ্ছ কাচ অল্প কিছুটা অস্বচ্ছও হয়েছে। তার ফলে কাচের ওপারের ঘর বাড়ী রাস্তা ফুটপাথ মানুষজন সব স্পষ্ট দেখা গেলেও আমার রুমের দিকের জিনিসপত্র খুব সামান্য হলেও ওই ধুলোজমা কাচে প্রতিফলিত হয়ে আয়নার মতো কাচের ওপারে যেন শূন্যে ভেসে উঠেছে। যে জিনিসে আলো বেশী পড়েছে কেবল তাদেরই প্রতিবিম্ব আবছা দেখা যাচ্ছে। আমি জানালার কাছে দাঁড়ানোয় আমার প্রতিবিম্বও সামান্য দেখা যাচ্ছে। আমার শরীর ও জামাকাপড় যতটা প্রতিফলিত হচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রতিফলিত হচ্ছে আমার বাঁ হাতে পরে থাকা হাত ঘড়িটা। ঘড়িটার 'ডায়াল' ও তার চারদিকের 'ফ্রেমটা' ছিল স্টীল কালারের। ওই ফ্রেমশুদ্ধ ডায়ালের অংশটুকুই বেশী স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বাকী অংশ এতটা অস্পষ্ট ছিল যে সে প্রতিবিম্বগুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। ওই ঘড়ির ডায়ালের প্রতিবিম্বই আমার কাছে ভয়ের আবহে 'গরুর চোখ' মনে হয়েছিল। আমি অনুসন্ধান না করলে ওটা আমার কাছে চিরকালই গরুর চোখ হয়ে, অর্থাৎ স্বচক্ষে দেখা গো-ভুতের ঘটনা হয়েই থেকে যেত।

(ভুত দুই) – ভুতে গাছ থেকে গুঁড়ো মাটি ছুঁড়লো –

আমাদের তিনদিক ঘেরা হস্টেল বিল্ডিং-এর মধ্যিখানে ছিল একটা ভলিবল কোর্ট। আর তার উল্টোদিকে ছিল কিছু আম-কাঁঠালের গাছের সারি। আর সেদিকের ডানদিকের কোণে ছিল একটা জলের কল যাতে ২৪ ঘন্টা জলপাওয়া যেত। আমাদের কয়েকজন বন্ধুর অভ্যেস ছিল রাত জেগে পড়াশোনা করা। আবার কেউ বা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তাম, আর খুব ভোরে উঠে পড়তাম। একদিন আমি রাত সাড়ে তিনটেয় উঠে পড়েছি। উঠে তিনতলা থেকে নেমে নীচে ভলিবল কোর্টে পায়চারী করতে করতে দাঁত ব্রাশ করছি। সবাই তখন ঘুমাচ্ছে। চারদিক নিস্তব্ধ। দাঁত ব্রাশ হয়ে গেলে আমি ওই কলতলায় বসে মুখ ধুচ্ছি। মুখ ধোয়া যখন প্রায় শেষের দিকে তখন হঠাৎ আম-কাঁঠালের গাছগুলো থেকে ঝুর ঝুর করে একগাদা গুঁড়ো মাটি যেন ঘন পাতার ভিতর দিয়ে ঝরে পড়ল নীচে। আমি চমকে উঠে ফিরে তাকালাম। কেউ কোথাও নেই। কোনো মাটির গুঁড়ো ও তো আর পড়ছে না। মুহূর্তে একবার ছোটবেলার কথা মনে পড়লো। তখন ভোরবেলা গ্রামের কোনও কোনও ছেলে মেয়ে 'কোনি-বাম্‌নীর' আম বাগানে পাকা আম কুড়াতে যেত। সেখানেও ওই ভোররাতে গাছ থেকে মাটির ঢেলা পড়তে অনেকে দেখেছে। তারা বলতো ভুতে ঢিল ছুঁড়েছে। বাবা অবশ্য বলতেন দিনের বেলা আম পাড়তে গিয়ে ছেলেরা গাছে ঢিল ছোঁড়ে। তারই দু'একটা গাছে আটকে যায়। সেগুলোই অনেক সময় হাওয়া লেগে অসময়ে নীচে পড়ে। কিন্তু হস্টেলের ব্যাপারটা তো আলাদা। প্রথমতঃ একটা দুটো নয়, অসংখ্য গুঁড়ো মাটি

একসঙ্গে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ তখন কোনও হাওয়া ছিল না। তৃতীয়তঃ তখন আমপাকার সিজনও ছিল না। চতুর্থতঃ ওদিকে পাঁচিলের আশে পাশে বাচ্চা ছেলেদের কোনও খেলার জায়গাও ছিল না। তাই এটা কি তবে ভৌতিক ব্যাপার? ভয় পেয়ে যত দ্রুত সম্ভব তিনতলায় নিজের রুমে ফিরে এলাম। ভুতের-ভয়ে পালিয়ে এসেছি। ভয় তাই আরও বেড়েই চলেছে। কিন্তু একটু থিতু হবার পর মন বলল – ভুত বলে কিছু নেই। আমি নিশ্চিৎ। অতএব অনুসন্ধান করো, ইনভেস্টিগেট। জলের কলটা যে দিকে ছিল সেই দিকের তিন তলার বারান্দায় এগিয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আশপাশটা দেখছি আর ভাবছি, কী হতে পারে। মিনিট সাত-আট অপেক্ষার পর রহস্য ভেদ হলো। হস্টেলের যে দিকে গাছের সারি সেইদিকের বাউন্ডারির ওপারে যে তিনতলা বাড়িটা তার তিনতলাতে থাকে একজন বিদঘুটে হাফ্-পাগল লোক। সে একাই থাকে। সে সব উল্টো কাজ করতো। 'ব্ল্যাক-আউটের' সময় সাইরেন বাজলে সবাই যখন ঘরের আলো নিভিয়ে ফেলত, অন্ধকার উত্তর কোলকাতায় সে-ই শুধু তার বারান্দায় একটা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখত। আবার যখন সবাই আলো জ্বালিয়ে দিত সে তখন তার আলো নিভিয়ে পেলত। সেই হাফ-পাগলা লোকটা করেছে কী, ওই রাত্তির সাড়ে-তিনটেয় সে তার রান্নাঘরটা ঝাঁটা আর জল দিয়ে ধুচ্ছিল। আর জল বেরোনোর পাইপ জ্যাম থাকার কারণে হোক বা 'আউটলেট' আদৌ না থাকার কারণে হোক, সে একটা ন্যাতা দিয়ে সেই ঘর-ধোয়া জল একটা খালি বালতিতে ছুপিয়ে ছুপিয়ে তুলছিল। বালতি ভরে গেলে হস্টেলের আম-কাঁঠালের গাছগুলোর ওপর সেই জল ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আমার চোখের সামনে যেই সে এক বালতি জল ছুঁড়ে দিলো তখন হ্যাঁ, সেই একই শব্দ তো! যেন একগাদা গুঁড়ো মাটি ঝরে পড়ল। অনুসন্ধান না করে ভয়ে ঘরে খিল আঁটলে এ রহস্য কোনদিনও ভেদ হতো না।

(ভুত তিন) – ভুতে ফাইল দেখছে,
বসে বসে টাইপ রাইটারে টাইপ করছে –

স্থান – বি. এন. আর রেল অফিস, নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সাত তলা। সময় সন্ধে সাতটা – সাড়ে সাতটা। আমি আমার ছোট্ট চৌখুপির মধ্যে একমনে ফাইল দেখছি। সাড়ে ছ'টায় সরকারী অফিস ছুটি হয়ে গেছে। বাইরে কখন্ একসময় কেয়ারটেকার এসে বিদ্যুৎ বাঁচানোর নিয়ম মেনে একটি মাত্র আলো ছাড়া বড় হলের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হোল চৌখুপির বাইরে কে যেন বসে ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছে। দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। এবার বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে কাজ করছি। একটু পরে হঠাৎ মনে হোল, হলঘরের কোণে কে যেন বসে বসে খটাখট টাইপ করছে। করছে তো করছে, বেশ করেছে। ভাবলাম, আমি এখন উঠবই না, আমার ফাইল দেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এক সময় টাইপ করার শব্দ থেমে গেল। আবার একটু পরে শুনি কে যেন আমার চৌখুপির বাইরেটায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। পাতা ওল্টানোর খস্ খস্ শব্দও হচ্ছে। এবার একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। বিশেষ করে যখন মনে পড়ল শুনেছিলাম তো ওই সাত তলাতে কে একজন স্টাফ নাকি এক কালে সুইসাইড, হ্যাঁ আত্মহত্যা করেছিলো। একবার ভাবলাম একা একা এখানে কাজ করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। উঠে পড়ি, কোয়ার্টার্সে চলে যাই। চলেই যাচ্ছিলাম। পরে ভাবলাম, যেতে হয় যাবো, তবে ভয়ে নয়, ভালো করে তদন্ত করে তবে যাবো। চেম্বারের বাইরে নিঃশব্দে হঠাৎ করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম যাতে কেউ পালাবার বা লুকিয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। কিন্তু না, দেখলাম কেউ কোথাও নেই। তখন বেশ কয়েকটা আলো জ্বেলে ফেললাম। আলোতে দেখি কিছু ইঁদুর টেবিলের উপরে, নীচে, বাবুদের টিফিনের উচ্ছিষ্ট বাদাম, চিঁড়ে ভাজা ইত্যাদি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছিল। তারা দৌড়ে পালালো। একটা দেওয়ালের গায়ে ইলেকট্রিকের মোটা কেব্‌ল্ তারের ওপরে বসে একটা 'ভাম' আমার দিকে ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকিয়ে আছে। তার দেহ যতটা লম্বা, লেজও ততটা প্রায়। তাকে আর ডিসটার্ব করলাম না। মনে মনে বললাম, তোরা তোদের কাজ কর, আমি আমার কাজ সারি। এমন সময় হঠাৎ আবার সেই টাইপ করার শব্দ শোনা গেল। সেটা চতুর্থ তলে কোনও স্টেনোগ্রাফার তার অফিসারের ডিকটেশান্ নিয়ে টাইপ করছিল। তারই শব্দ উল্টোদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আমার কানে আসছিল। আর মনে হচ্ছিল যেন সাত তলারই এক কোণে অন্ধকারে বসে কেউ টাইপ করছে। এরপরে আর কোনদিন আমি ভয় পাই নি। ভুতেও আমাকে ভয় দেখায় নি।

এরকম অসংখ্য ঘটনার উদাহরণ আছে এবং তার সব কটারই প্রকৃত কারণ 'অনুসন্ধানে' ধরা পড়েছে।

ভুতেরা আসে আধো অন্ধকারে বা পুরো অন্ধকারে-রাত্রে। আসে আমরা যখন একা থাকি। আর, যখন আমাদের অতীতে শোনা কোনও ভুতের গল্পের সঙ্গে সামান্য মিল খুজে পাই। আর, যখন ভুত দেখার পর 'অনুসন্ধান' করিনা, ভয়ে পালিয়ে যাই। মনে বিশ্বাস রাখতে হবে যে ভুত বলে কিছু নেই। এই বিশ্বাস নিয়ে অনুসন্ধান করলে যে কোনও ভৌতিক ঘটনার প্রকৃত কারণ ধরা পড়বেই। মিথ্যে ভুতের পর্দা ফাঁস হবেই।■

নবম বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সংগঠন সংবাদ ঃ

হাওড়া জেলার আমতা ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত

কৃষিমেলায় ব্যাপক জনসমাগম

গত ২৬শে জানুয়ারি ২০১৯, হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত কানপুর হাটতলার নিকটবর্তী একটি খেলার মাঠে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র আমতা ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি কৃষিমেলার আয়োজন করা হয়। বিশাল আকৃতির খেলার মাঠে দুপুর ২টার পর থেকে কৃষকরা সমাবেশিত হতে শুরু করেন তাঁদের উৎপাদিত ফসল মেলায় প্রদর্শনের জন্য। একে একে আশপাশের গ্রামগুলির প্রায় ৪২ জন কৃষক তাঁদের পারিবারিক শ্রমে উৎপাদিত ফসল নিয়ে জড় হন। লাউ, বাঁধাকফি, ফুলকফি, আখ, মূলা, খাম আলু, পালংশাক, মান কচু, ব্রোকেলি, ওল কফি, ওল কচু, ফুল, পেঁয়াজ, বেগুণ, কুমড়ো, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি দর্শনীয় ফসল নিয়ে কৃষকরা প্রদর্শন শুরু করেন। এলাকার পাঁচজন প্রবীণ কৃষক প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধীন সঙ্গীত দিয়ে মেলা শুরু হয়। আস্তে আস্তে শত শত নারী-পুরুষ-শিশুতে মাঠ ভরতে থাকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে 'সেরার সেরা' ১০ জন কৃষক সহ প্রত্যেক কৃষককে সম্মান জানানো হয়। কৃষক ছাড়াও পাশাপাশি অঞ্চলের নবীন ও প্রবীণ শিক্ষক, চিকিৎসক এবং অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রবীণ শিক্ষক উদ্বোধনী ভাষণে কৃষকদের সম্মান জানিয়ে কৃষিমেলার আয়োজনের জন্য এবং প্রত্যেক কৃষককে তাদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ দেওয়ার জন্য সংগঠনকে অভিনন্দন জানান। একে একে কৃষকরা মঞ্চে এসে তাদের সমস্যা ও দাবিগুলি তুলে ধরেন। যে যে সমস্যাগুলি উঠে এসেছে তার সংক্ষিপ্তসার হল – এলাকার সেচ খালে জল নেই, বহু খরচ করে বহুদূর থেকে সেচের জল আনতে হচ্ছে। সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে

অথচ শতকরা ৯০-৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ হিসাবে বাজারে দাম মিলছে না। পারিবারিক শ্রমের মূল্য এবং মুনাফা তো দূরের কথা উৎপাদন খরচটুকুও বেশিরভাগ সময় উঠছে না। কেউ বললেন মাটি পরীক্ষায় সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। কেউ বললেন জানা না থাকায় সারের ব্যবহার বহুসময় কম বা অতিরিক্ত হওয়ায় ফলনে মার খাচ্ছেন। কেউ বললেন অতিরিক্ত রাসায়নিক (অজৈব) সার ব্যবহারে জমির ক্ষতি হচ্ছে। কেউ বললেন মহাজন এবং ফড়েদের কাছে গরীব কৃষক সর্বশান্ত হচ্ছে। সরকার ফসল কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পালন করছে না। কেউ বললেন সরকার বর্গাচাষীদের দুঃখ দেখছে না। অধিকাংশই মনে করছেন চাষে কোন লাভ নেই, সকলেই বিকল্প রুজির কথা ভাবছেন, কৃষি থেকে যে আয় হয় তাতে ছোট বা মধ্যচাষীর সংসার চলে না। বাজারে সমস্ত জিনিসের দাম আগুন কিন্তু কৃষক ফসল ফলিয়ে দাম পাচ্ছেন না। একজন বক্তা বলেন আজ প্রজাতন্ত্র দিবস, অথচ বিজ্ঞান মনস্ক এই দিনে অনুষ্ঠান করলেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেনি – এটা দেশপ্রেমের পরিচয় নয়, আমি প্রতিবাদ করছি এই আচরণের। এই বক্তব্যে ভিড়ে ঠাসা মেলায় গুঞ্জন ওঠে।

এর জবাবে সংগঠনের প্রতিনিধি বলেন, এই কৃষিমেলার সাথে কোন দিবস প্রতিপালনের কোন সংযোগ নেই। আজ সারা দেশে নানাভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন হচ্ছে। কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে দেশের 'প্রজাদের' অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবীদের স্বাধীন মতপ্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কি? আমরা মনে করি যদি 'প্রজাতন্ত্র' হয় তবে প্রজাসাধারণ তথা কৃষকসহ মেহনতী মানুষের দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ, অভিযোগ, দাবি,

4th COVER

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০.০০ টাকা Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

● *কৃষিমেলায় ব্যাপক জনসমাগম*

অধিকার নিয়ে মুক্তকণ্ঠে মতপ্রকাশ করতে দেওয়া দরকার। বিজ্ঞান মনস্ক এই 'প্রজাতন্ত্র' দিবসে এলাকার কৃষকসমাজ তথা গ্রামবাসীকে তাঁদের দুঃখ, যন্ত্রণা, অভিযোগ, দাবি নিয়ে মুক্তকণ্ঠে মতপ্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। যে সমাজে কৃষক তথা শ্রমজীবী জনতার কোনও সম্মান নেই তাদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য আজ কৃষিমেলার আয়োজন করেছে। এটাই প্রকৃত অর্থে প্রজাতন্ত্র পালনের উদাহরণ নয় কী? আপনারা ভেবে দেখুন। আমরা যদি ভুল বলে থাকি তবে শাস্তি দিন, দূরে সরিয়ে দিন, নইলে আসুন একতাবদ্ধ হই। গ্রামগঞ্জের ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের আলো, প্রগতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হন। শ্রমজীবী জনতা বা কৃষকের শ্রমের প্রকৃত মূল্য অর্জনের জন্য, মর্যাদা অর্জনের জন্য সংগঠিত হোন। আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজ্ঞান মনস্ক পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা একদিনের মেলা নয় সারাবছর আপনাদের সমস্যা, আন্দোলনের পাশে থাকতে চাই। বছরে অন্তত দুইবার কৃষিবিজ্ঞানীদের সাহায্যে কৃষকদের ট্রেনিং করানোর ব্যবস্থা করার প্রয়াস নেব। বিজ্ঞান মনস্ক'র বক্তব্যকে উপস্থিত শত শত জনতা হাততালি এবং উচ্ছাস প্রকাশ করে সমর্থন জানায়।

কৃষক সাধারণ, এলাকার শিক্ষক মহাশয়রা এই ধরনের উদ্যোগকে আরও প্রসারিত করার জন্য উপস্থিত জনতার কাছে আহ্বান রাখেন। বক্তব্যের মাঝে মাঝে আবৃত্তি এবং নৃত্যগীতি পরিবেশন করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারা, শিশু এবং কিশোরীরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি মেলাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সবশেষে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে উন্নত দুনিয়ার আধুনিক কৃষিব্যবস্থার চিত্র প্রদর্শন করা হয়। উন্নত যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিভাবে ফসল বুনন থেকে সেচ দেওয়া, কাটা, ঝাড়াই-বাছাই করে মেশিনের সাহায্যে গুদামজাত করা হয়; কিভাবে জমির স্বল্পতার সমাধানের জন্য ভার্টিকাল ফার্মিং, ফার্মে বিভিন্ন স্তরে স্তরে চাষাবাদ হয়; শুষ্ক এলাকায় জলের সমস্যা দূরীকরণের জন্য কৃত্রিম বৃষ্টিপাত (এদেশের মহারাষ্ট্রেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে) করা হয়; কিভাবে উন্নত প্রযুক্তিতে বিশাল আকারের ফল ও সব্জি চাষ হয়; কিভাবে একই গাছের কান্ডে টম্যাটো এবং মূলে আলু'র ফলন হয় ইত্যাদির ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রূপায়ণ সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্র জমিতে যে বেশি সম্ভব নয় এর জন্য বৃহৎ কৃষিফার্মের প্রয়োজন একথাও বলা হয়।

উপস্থিত সমস্ত কৃষকদের সম্মানিত করার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র আমতা ইউনিটের পক্ষ থেকে আয়োজিত কৃষিমেলার সমাপ্তি হয়।■

বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক

কলেজ স্কোয়ার বইমেলায়

শীতকালীন মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক হাজির থেকেছে সমীক্ষণ এবং INSIGHT নিয়ে। শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বইমেলা, শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে শিবমন্দির-এ আয়োজিত শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর বইমেলা, কলকাতা'র বেহালা চৌরাস্তা'য় বেহালা বইমেলা, বড়িশা অঞ্চলের শখের বাজারের বইমেলা; পুরুলিয়া শহরের বইমেলা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা সদর আসানসোল বইমেলা; কলকাতা'র কলেজ স্কোয়ারের লিটল ম্যাগাজিন বইমেলায় আমাদের মুখপত্রগুলি সহস্রাধিক পাঠক সংগ্রহ করেছেন। মেলাগুলিতে পাঠকদের সাথে সংগঠনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।■

শিলিগুড়ি বইমেলায়

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com